তৃতীয় সংখ্যা

NASEEHAH

নাসিহাহ

naseehahmagazine@gmail.com

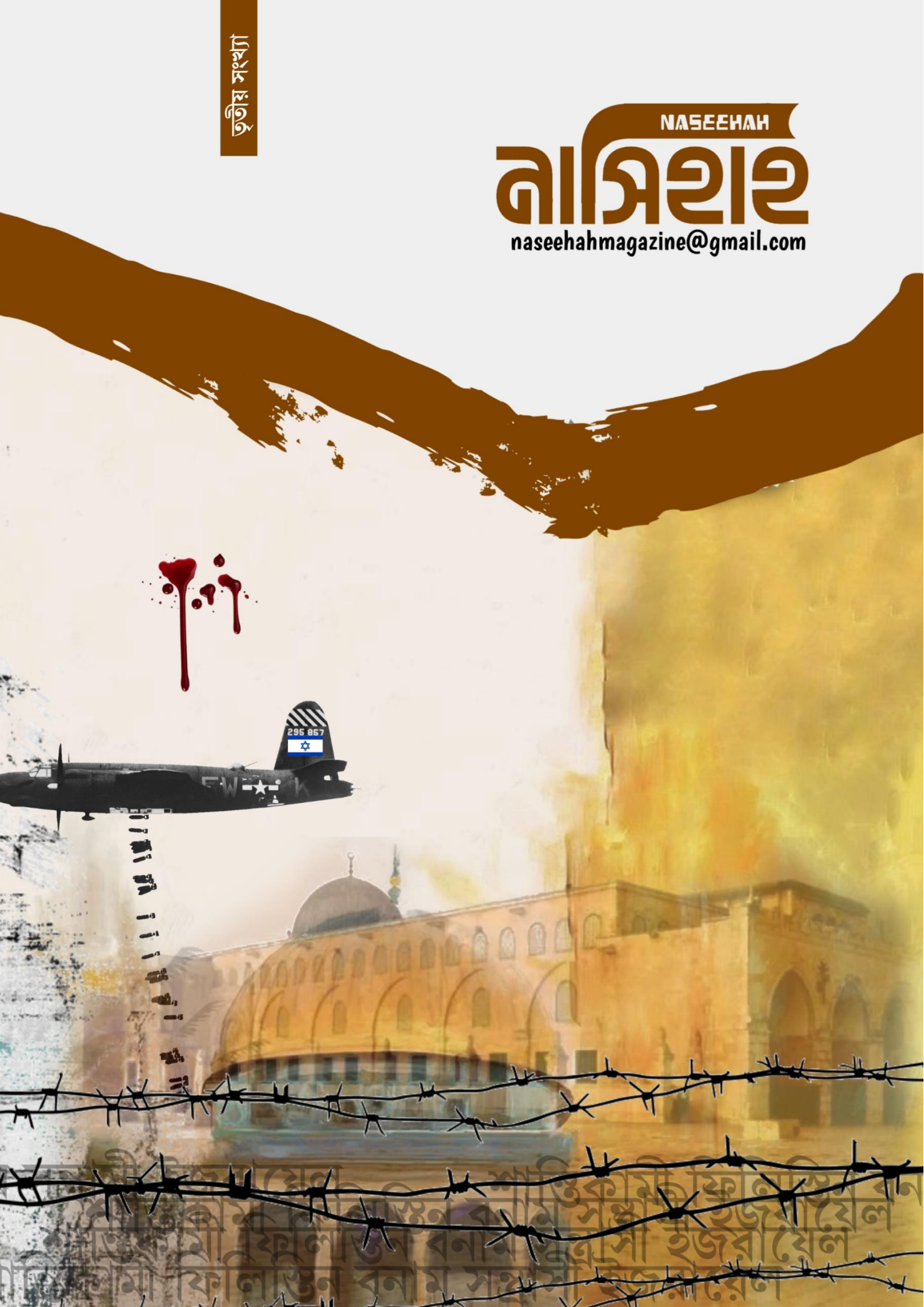

বয়কট জোরদার হোক!

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ্, নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন, আমরা আজ এমন সময় পার করছি যখন সারা বিশ্বের অমুসলিম শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের নাম মুছে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। বিশেষভাবে ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলের চলমান হামলার কথা কারো অজানা নয়। প্রতিদিন শত শত মুসলিমকে শহীদ করা হচ্ছে। নারী ও শিশুদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বসতভিটা। ভিটেমাটি-হীন মুসলিমরা আজ উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে ফিরছে আর অপেক্ষা করছে সন্ত্রাসীদের বোমার আঘাতে শাহাদাত বরণ করা বা চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার। চলমান পরিস্থিতিতে আমাদের অনেক করণীয় থেকে একটি হলো, অবৈধ সন্ত্রাসী ও তাদের সহচরদের সকল পণ্য বয়কট করা। পণ্য বয়কটের প্রভাব সচেতন সকলেরই জানা আছে। অনেকে বুঝে বা না-বুঝে বয়কটের বিষয়টিকে হীন জ্ঞান করে থাকে; যা তাদের জ্ঞানের অপ্রতুলতার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া বয়কটের আওতায় শুধু ইসরায়েলী পণ্য নয়, বরং তাদের সহযোগীদের পণ্যও অবশ্যই আছে। তাই 'এসব ইসরায়েলী পণ্য নয়' বা 'ফেইসবুক বয়কট করুন' ইত্যাদি অযাচিত কথাবার্তা ত্যাগ করে আসুন বয়কট আরো জোরদার করি। ইসরায়েলসহ সকল অমুসলিমদের পণ্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি; বিকল্প পণ্য ব্যবহার করি। মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসি।

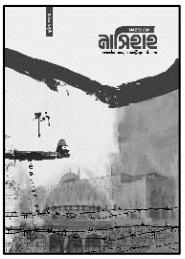

নাসিহাহ - Naseehah

১ম বর্ষ ♦ ৩য় সংখ্যা ♦ ডিসেম্বর ২০২৩ইং

◆

সম্পাদক :

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক :

মুফতি তানজীল আরেফিন আদনান

ডিজাইন, কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা :

নাসিহাহ কম্পিউটার

(www.facebook.com/naseehahcomputer)

◆

ই-মেইল :

naseehahmagazine@gmail.com

◆

সার্বিক যোগাযোগ

ভেতরে যা আছে

তুফানুল আকসা : উম্মাহর মুক্তির পাঠ	৫
ইতিহাসের আয়নায় আল কুদস	১১
এভাবে পথচলা আর কতদিন?	১৩
গোয়েন্দা বিভাগ কি এই প্রথমবার ব্যর্থ?	১৭
ফেরেশতারা নেমে এসেছিলেন পৃথিবীর কাছাকাছি	২১
আল আকসা কোনটি? কালো গম্বুজ নাকি হলুদ গম্বুজ?	২৩
হামাসের ইসরাইল হামলা কি ভুল ছিলো?	২৬
আমিও উহুদকে ভালোবাসি!	২৮
ক্ষমা ও মার্জনা মুমিনের উত্তম আখলাক	৩১
মিডিয়ায় মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা	৩৪
মূল্যায়ন সফলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ	৩৬
মহরে নবুওয়াত : এক টুকরো গোশতের ইতিবৃত্ত!	৩৮
শায়েখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার সান্নিধ্যে এক বিকেল	৩৯
এক মহিরুহ মাওলানা : জীবন, কর্ম ও ইতিহাস	৪২
রোযনামচা	৪৪

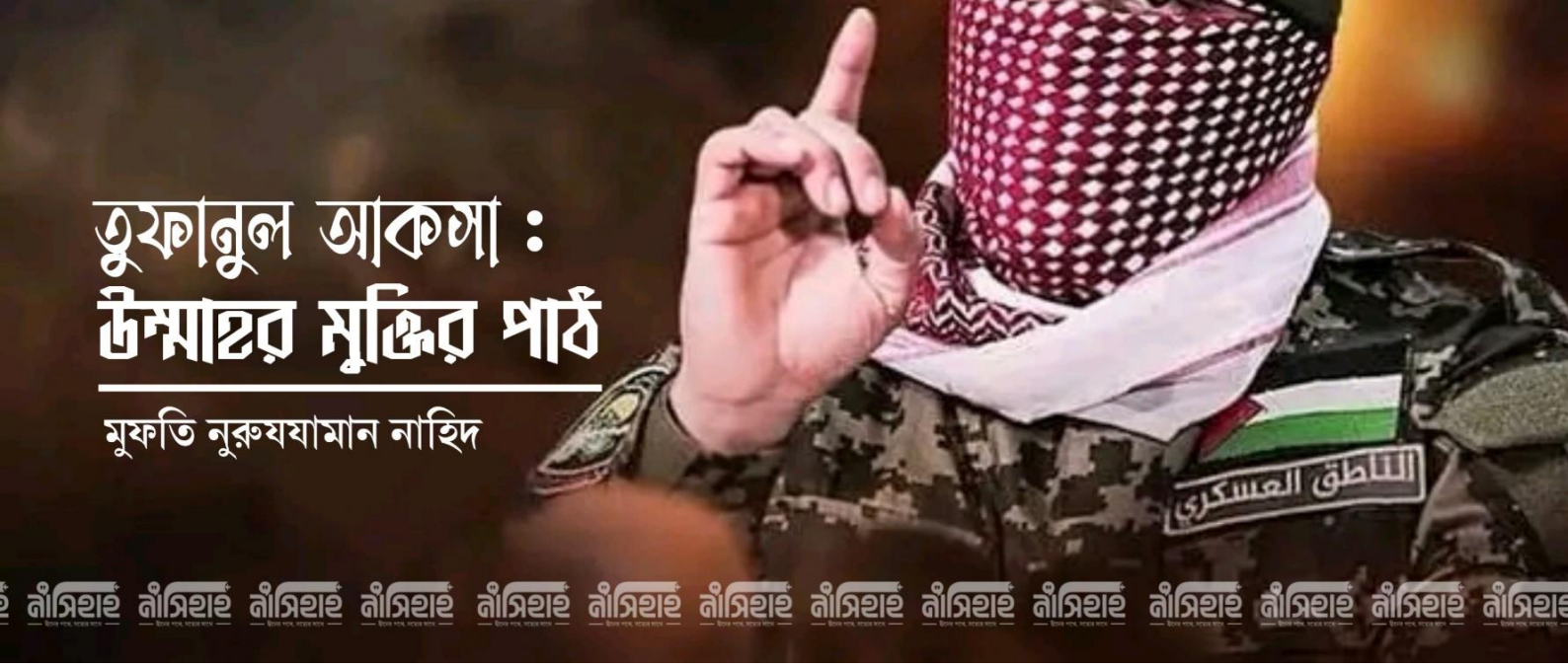

তুফানুল আকসা : উম্মাহর মুক্তির পাঠ

✍ মুফতি নুরুযযামান নাহিদ

চলমান ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। মাত্র ষাট হাজার সেনা নিয়ে চার লাখের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছে হামাসের মুক্তিকামী মুমিন মর্দে মুজাহিদরা। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য কামনা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শত্রুর সম্মুখে। লাফ দিয়ে চড়ে বসেছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ট্যাংকবহরের ঘাড়ে। আল্লাহর সাহায্য এসেছে।

এই লেখাটি যখন লিখতে বসেছি ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধের তখন পঁয়ত্রিশটা দিন পার হয়ে গেছে। গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ইং, শনিবার **'তুফানুল আকসা'** শিরোনামে হামাসের দুঃসাহসী সেনাবাহিনী ইযযুদ্দীন কাসসাম বিগ্রেড ইসরাইলের ওপর হামলা শুরু করলে ইহুদিবাদী দখলদার রাষ্ট্রটা মরণকামড় দেওয়ার জন্য হামলে পড়েছিল। বিশ্বের তাবৎ যুদ্ধবিশেষজ্ঞ সমস্বরে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, হপ্তাখানেকের মধ্যে দেখা যাবে হামাসের এই 'বালকসুলভ' আক্রমণের পরিণতি। পরমাণু শক্তিধর ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে এক সপ্তাহ টিকতে পারবে না 'ঢাল-তলোয়ারহীন' হামাসবাহিনী। কিন্তু তুমুল বিস্ময় নিয়ে গোটা দুনিয়া দেখছে, ৩৫টি দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও হামাসের মরণজয়ী মুজাহিদরা বীরবিক্রমে নাস্তানাবুদ করে চলেছে বর্বর দখলদার ইহুদি হায়েনার সেনাঘাঁটিগুলো; একের পর এক। হাতে বানানো বোমার আঘাতে খেলনা গাড়ির মত টুকরো টুকরো করে ফেলছে সহস্র কোটি ডলারের মারকাভা ট্যাংক, সাঁজোয়া যান। প্রোপাগাণ্ডার মহাজনক ইহুদি রাষ্ট্রটি খোদ স্বীকার করেছে ১৩৬টি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের; যার একেকটির মূল্য ৪০ কোটি থেকে ৬০ কোটি টাকা পর্যন্ত। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের চোখ কপালে উঠে গেছে। কখন, কীভাবে এত শক্তি সঞ্চয় করলো গাজার ও মসজিদুল আকসার অতন্দ্র প্রহরী ছোট্ট এই সেনাদলটি? কী করে নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছে প্রবল পরাক্রমশালী সুপার পাওয়ার রাষ্ট্রগুলোর একমাত্র

নমস্য জারজ রাষ্ট্রটিকে? অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে বাধ্য হয়ে তারা 'যুদ্ধ বিরতি'র নামে পালাবার পথ খুঁজছে। ইহুদিসেনাদের জন্য ভয়ঙ্কর বদ্ধভূমি হয়ে ওঠা গাজা উপত্যকা থেকে জান নিয়ে পালাবার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই আর। আফগানিস্তান দখলের লালসায় আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মহাঅহমে হিন্দুকুশের সীমান্ত অতিক্রমকারী নির্লজ্জ আমেরিকান বাহিনী যেভাবে পালাবার পথ না পেয়ে দিশেহারা, উদ্ভ্রান্ত, উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, ভয়ে-আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল; টানেল থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসা 'আবু উবায়দা'র সাথীদের অতর্কিত হামলায় ইহুদিবাদী রাষ্ট্রটির প্রবঞ্চিত সেনাদের পরিণতিও সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। সময় থাকতে পরাজয় স্বীকার না করলে 'আবরাহাবাহিনীর' পরিণতি বরণ ছাড়া উপায় পাবে বলে মনে হয় না।

মসজিদুল আকসার মুক্তিকামী মুজাহিদ বাহিনীটির এবারের হামলা বিশ্ব মুসলমানের জন্যে নিয়ে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা। বিজয় ও স্বাধিকার ভুলতে বসা নির্জীব মুসলিম উম্মাহর জন্য নবতর প্রেরণা নিয়ে আবর্তিত হয়েছে 'তুফানুল আকসা'। ভাব ও চিন্তার আকাশে সামান্য দ্যোতনা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় কয়েকটি অনুষঙ্গে আলোকপাত করবার মনস্থ করেছি। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

➢ ১. ইমানি শক্তিই প্রকৃত শক্তি

চলমান ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন হামাসের সেনাসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। বিপরীতে পরমাণু শক্তিধর পৃথিবীর আধুনিকতর রণসম্ভারে সজ্জিত সুপ্রশিক্ষিত ইসরাইলি বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল এক লাখ। যুদ্ধ শুরুর ক'দিনের মাথায় বিপদ বুঝতে পেরে রিজার্ভে থাকা আরও তিন লাখ প্রশিক্ষিত সেনা ময়দানে নামিয়ে আনে ইহুদিরাষ্ট্রটি। চার লাখ সেনার বিশাল বহর নিয়ে তারা গাজার মাত্র ৪৫ বর্গকিলোমিটারের ছোট্ট উপত্যকায় স্থলাভিযানের হুমকি দিলে হামাসের মুখপাত্র আবু উবায়দা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তেজস্বী উচ্চারণে হুশিয়ার করেছিলেন, ভুল করেও যদি গাজার সীমানায় পা রাখো পুরো উপত্যকা তোমাদের গোরস্থান বানিয়ে ছাড়বো। ভীতু ইহুদিগোষ্ঠী শুরুতে সাহস করতে না পারলেও 'মাসতুতো ভাই' পশ্চিমা সন্ত্রাসীদের অনুপ্রেরণায় ট্যাংকবহর নিয়ে গাজা এলাকায় ঢুকতে শুরু করলে মিনি সাইজের কেয়ামত নেমে আসে তাদের ওপর। অকুতোভয় ফিলিস্তিনি মুজাহিদরা ট্যাংকের ওপর চড়ে কপালে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে মারতে শুরু করে তাদের। 'আবাবিলে'র মত ঝাকে ঝাকে ড্রোন পাঠিয়ে মুড়ি-মুড়কির মত ভাজতে থাকে আর্টিলারি আর সাঁজোয় যান। জীবনবাজি রেখে ট্যাংকের নিচে ঢুকে খালি হাতে বোমা পেতে বেরিয়ে আসতে থাকে বীরদর্পে। ভয়ডরহীন এসব মুসলিম যুবাদের কর্মকাণ্ডে হতবাক বিশ্ব। কোত্থেকে অর্জিত হয়েছে এই দুঃসাহস? আর কিছু নয়; এই দুঃসাহসের গোড়ায় সিঞ্চিত হয়েছে ইমানি শক্তি, শাহাদাতের তামান্না আর জান্নাতের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। ইসলামি ইতিহাসের পাঠকমাত্র জানেন, বীর জাতি মুসলিমরা ঢাল-তরবারির ভরসায় যুদ্ধে নামে নি কখনো; নেমেছে ইমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শাহাদাতের পরম তৃষ্ণা নিয়ে। ফলে বদরের ঢাল-তলোয়ারহীন তিনশ তের'র সামনে পর্যুদস্ত হয়েছে সমরাস্ত্রে সজ্জিত সহস্র কাফের কুরাইশ। তিন হাজার দারিদ্রপীড়িত অভুক্ত মুজাহিদের মোকাবেলায় হেরে গেছে ১০ হাজারের আহযাব বাহিনী। মাত্র চব্বিশ হাজার মুজাহিদ কচুকাটা করেছে ২লাখ ৪০ হাজারের আধুনিক সমরসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত রোমানবাহিনীকে ইয়ারমুক প্রান্তরে। ৩০ হাজার

সেনা নিয়ে তৎকালীন সুপার পাওয়ার পারস্যের ২লাখ সেনাকে নাকানিচুবানি খাইয়েছে কাদিসিয়ার যুদ্ধে। ইমানি শক্তি আর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা বৈ কিছু ছিল না তাদের। আল্লাহ তাআলা বিজয় দিয়েছেন প্রতিটি প্রান্তরে। বরং যখনই শক্তিমত্তা আর সংখ্যাধিক্যের 'অহম' প্ররোচিত করেছে তখনই নেমে এসেছে সাময়িক বিপর্যয়। কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে :

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের আর এটি হল কাফেরদের কর্মফল। (সুরা তাওবাহ, আয়াত : ২৫-২৬)

চলমান ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। মাত্র ষাট হাজার সেনা নিয়ে চার লাখের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছে হামাসের মুক্তিকামী মুমিন মর্দে মুজাহিদরা। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য কামনা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শত্রুর সম্মুখে। লাফ দিয়ে চড়ে বসেছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ট্যাংকবহরের ঘাড়ে। আল্লাহর সাহায্য এসেছে। ৩৫টি দিন পার হয়ে যাওয়ার পর ট্যাংকের সুবিশাল বহর নিয়ে পালিয়ে যাবার ধান্দা করছে ইহুদিজাতি। সাহায্য ও বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। উম্মাহর ভীতু-কাপুরুষ নেতৃবর্গের এই যুদ্ধ থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা এটাই। মৃত্যুর ভয়ে কাতর, ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সন্ত্রস্ত নামসর্বস্ব মুসলিম নেতাদের তুলতুলে গালে সজোর চপেটাঘাত। দামী কাপড়ের 'আঁচল' সিধে করতে ব্যস্ত আরব নেতাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পেট্রোডলারের বিশাল খাযানা হাতে নিয়েও কেন চাটতে হচ্ছে কুফফারের পা।

➢ ২. দরকারি প্রস্তুতি গ্রহণ

দিনমান ইসরাইলি সেনাদের বন্দুকের নলে থেকেও কী করে এমন অসাধারণ সমরকুশল রপ্ত করলো হামাস? কী করে গড়ে তুললো বিশাল অস্ত্রের ভাণ্ডার? কী করে নিরবে-নিভৃতে গড়ে তুললো সুপ্রশিক্ষিত সেনাদল? আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের এমন অসাধারণ দক্ষতা কী করেই বা অর্জন করলো তারা? বিস্ময়ে চক্ষু ছানাবড়া করে এসব প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হচ্ছে পৃথিবীর তাবৎ যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞ। মোসাদের মত কুখ্যাত গোয়েন্দাবাহিনীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কীভাবে হয়ে উঠলো এমন দুরন্ত দুর্দম? ৭৫ বছর ধরে নির্যাতনে-নিপীড়নে বিপর্যস্ত গাজার মুসলিমরা অনন্যোপায় হয়ে বেছে নিয়েছে প্রতিরোধের পথ। হারাবার মত অতিরিক্ত কিছু নেই তাদের; প্রতিদিন প্রতিটি ক্ষণে তারা হারিয়ে চলেছে মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান। জন্মসনদে নাম ওঠার আগে মৃত্যুসনদে নাম উঠে যাচ্ছে বাবার কাঁধে নিথর পড়ে থাকা ফিলিস্তিনি শিশুর। ফলে জীবনের মায়া ত্যাগ করে মসজিদুল আকসা স্বাধীন করার অভিষ্ট লক্ষ্যে নিজেদের গড়ে তুলেছে তারা। শারীরিক সক্ষমতা যেমন অর্জন করেছে, সামরিক শক্তিও সঞ্চয় করেছে সমানতালে। মাত্র তিন বছরে হয়ে উঠেছে অদম্য এক অনুসরণীয় মুসলিম সেনাদল। সুপার পাওয়ারকে পরাজয়ের অন্ধকার দেখিয়ে দেওয়া নতুন এক পরাশক্তি।

➢ ৩. ইসলামি নীতিমালার ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণ

বলাবাহুল্য, পৌনে একশত বছরের এই জুলুম-পীড়নের পর শত্রুকে মুঠোয় পেলে চিবিয়ে খাওয়ার সাধ দমন করা কঠিন। যাদের কারণে আত্মীয়হারা হতে হয়েছে, ভিটেমাটি হারাতে হয়েছে সেইসব দখলদারদের সদস্য হাতে পেয়েও নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মহাউদারতা কেবল তারা দেখাতে পারে ধর্মগ্রন্থ যাদের শিখিয়েছে ক্ষমার আদর্শ আর নবীজী যাদের শিখিয়েছেন 'শত্রু'কে মুক্তি দেওয়ার সুমহান বদান্যতা। হামাসের হাতে বন্দী নারী-শিশুরা পশ্চিমা মিডিয়ার প্রোপাগাণ্ডার মুখে চপেটাঘাত করে বিশ্বকে জানিয়েছে, বন্দী হিসেবে কোনরকম নির্যাতন করা হয়নি তাদের ওপর। বরং অসুস্থ বন্দীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নারী-শিশুদের দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। সন্দেহ নেই, ইসলামি মূলনীতির ওপর অটল থাকার ফলেই এমন মহৎকর্ম তাদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। বিপরীতে নির্লজ্জ ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইলের কথা ভাবুন, এক সপ্তাহের বেশী সময় যাবত তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে হাসপাতালগুলো। একের পর এক হাসপাতাল লক্ষ্য করে বিমান হামলা করছে তারা। গাজায় স্থল হামলা শুরুই করেছে হাসপাতালে বোমা মেরে। এরা পৃথিবীকে সভ্যতার সবক দেয়। এদের দোসররা 'মানবাধিকার গপ্প' শোনায়। অথচ, অসুস্থ নারী-শিশুদের ওপর বোমা মারার সময় এসব কাপুরুষরা বিবেক-বুদ্ধি বর্গা দিয়ে আসে। আমরা বিশ্বাস করি, যুদ্ধের ময়দানেও ইসলামের মহান আদর্শ ও নীতির ওপর অটল থাকাই হামাসের আজকের বিজয়ের নিয়ামক।

➢ ৪. রব্বে কারিমের সামনে আত্মসমর্পণ

মুমিনমাত্র সকল কথা-কাজে নিজেকে রব্বের ফয়সালার সম্মুখে সমর্পণ করতে হয়। যা তিনি নিষেধ করেছে তা ত্যাগ করতে হয়। তা করতে আদেশ করেছেন বিনাপ্রশ্নে তার সম্পন্ন করতে হয়। হামাসের মুজাহিদদের মধ্যে এই গুণ বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে দেখছে। চাইলে যুদ্ধের এই ময়দানে অনেক হারাম কাজে তারা লিপ্ত হতে পারতেন। চাইলে বহির্শক্তির সাথে আঁতাত করে ধনবান হতে পারতেন। কেবল আল্লাহর জন্য তারা এসব ত্যাগ করেছেন। বরং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই তারা স্বাধিকার আন্দোলনে নেমেছেন। বুকের তাজা খুনের নাজরানা পেশ করে বাইতুল মাকদিস ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। আকসাকে স্বাধীন করতে ব্রতী হয়েছেন। রব্বের সামনে এমনতর আত্মসমর্পণের উদাহরণ মুসলিম ইতিহাস ছাড়া আর কোথাও মিলবে না।

➢ ৫. সবর ও ইস্তিকামাত

কিছুই ছিল না তাদের। এখনও নেই। যথেষ্ট রসদ নেই, পানির ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই। একমাত্র আল্লাহ ভরসা করে মাসাধিক সময় ধরে জিহাদ করে যাচ্ছে তারা। সবর ও ইস্তিকামাতের উত্তম উদারহণ স্থাপন করে যাচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে। বিজয় তো তাদেরই পদতল স্পর্শ করে তুমুল অভাব-অনটনের মাঝেও যারা 'তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ' বলে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে পারে। আহযাবযুদ্ধে আমরা তাই দেখেছি। দেখেছি জাতুররিকা, মুতার যুদ্ধে। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۞

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩০)

➢ ৬. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ

যুদ্ধের শুরুতেই তারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে ছুঁড়ে ফেলে উম্মাহকেন্দ্রিক চিন্তার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছে। কেবল গাজার স্বাধিকারের কথা তারা বলেনি; লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে মসজিদুল আকসার স্বাধীনতা। পুরো উম্মাহর আবেগ জড়িয়ে আছে যে মসজিদের সাথে। মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিসকে লক্ষ্য নির্ধারণ করায় উম্মাহর প্রতিটি গলি থেকে তাদের সমর্থনে তাকবির ধ্বনিত হয়েছে। ভিডিও বক্তৃতার মাধ্যমে তারা উম্মাহর প্রতিটি সদস্যকে এই যুদ্ধে শরিক হওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। প্রতিটি মুসলিমকে আহ্বান জানিয়েছে সামর্থের সবটুকু দিয়ে যাতে প্রতিরোধ করে বিশ্ব কাফেরগোষ্ঠীকে। প্রতিটি জনপদে যেন অপদস্থ হয় ইহুদিবাদী ও তাদের সেবাদাস দোসররা। হামাসের মুখপাত্র আবু উবাইদার প্রতিটি ভাষণ তাই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করছে উম্মাহর যুবাদের বুকে। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের কাছে নায়ক হয়ে উঠেছেন বীরত্বের ফিলিস্তিনি কণ্ঠস্বর আবু উবাইদা। আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখুন।

➢ ৭. কার্যকর ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার

৭৫ বছরের বিরতিহীন দীর্ঘ দমনপীড়নের মধ্যেও ফিলিস্তিনের শিক্ষিতের হার ৯০ শতাংশের অধিক। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের শিক্ষার হার ৯৮.২%। প্রায় একই অবস্থা গাজায়। বরং গাজার শিক্ষা আরও বেশী কার্যকর ও বহুমুখী।

- প্রসঙ্গত গবেষক মুসা আল হাফিজ সাহেবের একটি লেখার কিয়দংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

সেখানে সাক্ষরতার হার ৯০% এর অধিক । ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের সাক্ষরতার হার ৯৮.২%। উচ্চ শিক্ষার জন্য তালিকাভুক্তির অনুপাত ২০০৭ সালে ছিল ৪২.২%, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ। পশ্চিম তীরের পাশাপাশি হামাস শাসিত গাজায়ও শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। গাজায় বরং শিক্ষা আরো বহুমুখী, বৈচিত্রময়।

ফিলিস্তিনে সাধারণত তিন ধরণের স্কুল রয়েছে। ছেলেদের স্কুল (৩৭%) মেয়েদের স্কুল (৩৫%) আর সহশিক্ষার স্কুল (২৯%) । ফিলিস্তিনে আগে মুখ্যত সহশিক্ষার স্কুলেরই ছিলো প্রধান্য। হামাস ছেলে ও মেয়েদের আলাদা স্কুলের ধারণাকে কেবল জনপ্রিয় করেনি, বরং এতে শিক্ষার মানকে অনন্য উচ্চতা দিয়েছে, ফলে দুই দশকের মধ্যে চিত্র পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপক। শিক্ষার পাশাপাশি হামাস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ই-কমার্স এবং ফিনটেক সহ বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। প্রযুক্তিগত স্টার্টআপসমূহকে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করে। পাশাপাশি গাজা স্কাই গিক্স এবং প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনস টেকনোলজি ইনকিউবেটর (পিআইসিটিআই) এর মতো সংস্থাগুলি প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং স্টার্টআপদের জন্য সহায়তা, পরামর্শদান এবং অর্থায়নে নিবেদিত। STEM শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় ফিলিস্তিনে। ফিলিস্তিনের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে টেক সেক্টরে কর্মজীবনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য চালু হয় STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থাপনা। যা অগ্রসর এক প্রক্রিয়া। ফিলিস্তিন বিগত দশকগুলোতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে গণিতে ও প্রযুক্তিতে। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের 'আদর্শহীন' মুসলিম দেশগুলোর জন্য এতে রয়েছে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও শিক্ষা।

➢ ৮. আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার

প্রযুক্তি ও যোগাযোগ-মাধ্যম নিয়ন্ত্রনকারী কাফেরগোষ্ঠীর প্রোপাগাণ্ডার প্রধান হাতিয়ার সামাজিক গণমাধ্যম নামে পরিচিত ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউউটিউব ও টুইটার যখন অসহায় ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের ওপর চলমান দমন-পীড়নের সত্য চিত্র তুলে ধরার পরিবর্তে ইসরাইলি মিথ্যুকদের অভিনীত নাটক প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে আছে যুগান্তর যাবত তখন তুফানুল আকসার প্রথম দিন থেকেই অভাবনীয় উপায়ে সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রকৃত চিত্র তামাম বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হামাস। সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রোপাগাণ্ডাকারী পশ্চিমা মিডিয়ার ভণ্ডামি প্রকাশ করে দিয়েছে। অপরদিকে ড্রোন থেকে শুরু করে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর মাধ্যমে এতটা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে যে প্রযুক্তিতে বিশ্বের নেতৃত্ব দানকারী দেশ ইসরাইলের কুখ্যাত গোয়েন্দাবাহিনী মোসাদও ঠাহর করতে পারছে না কোন দিক থেকে উড়ে আসছে 'আবাবিল'। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও হামাসের সেনাদের খুঁজে পেতে ব্যর্থ টেক দুনিয়ার মহাবীর ইসরাইলি হ্যাকারগোষ্ঠী। এমন কি হামাসের হাতে পড়ার পর কোথায় লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছে বহুমূল্য খরচ করে তৈরী কমাণ্ডো সদস্যরা সেটাও বের করতে অক্ষম তারা। এখন তো সেনাদের লাশ বের করতেও 'মধ্যযুগীয় কায়দায়' শকুনের সহায়তা নিতে হচ্ছে তাদের। দুঃসাহসী মুসলিম মুজাহিদের হাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উঠে এলে কতটা বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে সে হামাসের এবারের আক্রমণ মুসলিম উম্মাহকে সেই বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। তারপরও কি চোখ খুলবে আকণ্ঠ আরামে ডুবে থাকা মুসলিম নেতৃবৃন্দের?

➢ ৯. বহির্বিশ্বের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ

অনেকেরই ধারণা ৭ই অক্টোবরের হামলা শুরুর আগে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করে সমর্থন আদায় করেছে হামাস। সহায়তার আশ্বাস গ্রহণ করেছে। ফলে যুদ্ধ শুরু হতেই লেবানন, জর্ডান, ইয়েমেন থেকে ইসরাইলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর এসেছে। হামাসের উচ্চপদস্থ অনেকেই ইউরোপের দেশগুলোতে অবস্থান করে যুদ্ধে সমর্থন আদায়ের এবং প্রোপাগাণ্ডার বিপরীতে সত্য তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ভিডিও বিবৃতির মাধ্যমে যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবগত করে যাচ্ছে তারা। তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে বারবার তুলে ধরছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফিলিস্তিনের পক্ষে মিছিল-সমাবেশ হয়েছে। আন্দোলন হয়েছে। এখনও হচ্ছে। ইসরাইলি ইহুদিদের যেখানে পাচ্ছে সেখানেই লোকজন উত্তম-মাধ্যম দিচ্ছে। ৪৫ বর্গকিলোমিটারের ধ্বংসপ্রায় বসতিতে বসে পুরো বিশ্বের সাথে এভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সমর্থন আদায় করা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয়। তাদের এই পদক্ষেপ মুসলিমবিশ্বের জন্য অনেক বড় শিক্ষা হয়ে থাকবে। আরও বেশকিছু শিক্ষনীয় বিষয় চলমান যুদ্ধ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে, স্থানাভাবে যা এখানে পরিবেশন সম্ভব নয়। আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, এই নয়টি শিক্ষা যদি মুসলিম উম্মাহর নেতৃবর্গ গ্রহণ করে অনতিদূর ভবিষ্যতে পুরো পৃথিবী তাদের হাতে শাসিত হবে, ইনশাআল্লাহ। মুসলিমদের বিজয় তো অবশ্যম্ভাবী। দরকার কেবল জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের বিজয়ের ও নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য প্রমাণ করা। ●

✍ লেখক :
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, রূপগঞ্জ।

ইতিহাসের আয়নায় আল কুদস

✍ মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী

'আল কুদস' জেরুসালেমের আরবি নাম, যাকে ইসলামপূর্ব সময়ে 'ইলিয়া'ও বলা হতো। এটি ৩১ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ শহরটি ভূমধ্যসাগর থেকে ৭৫০ মিটার উচ্চতায় এবং মৃতসাগর থেকে ১১৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। ভূমধ্যসাগর থেকে এর দূরত্ব ৫২ কিলোমিটার, মৃতসাগর থেকে ২২ কিলোমিটার আর লোহিতসাগর থেকে ২৫০ কিলোমিটার।

আল কুদস পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর। মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদি সবার কাছেই একটি স্মৃতিবিজড়িত বরকতময় সুন্দর আবহাওয়ার স্বাস্থ্যকর শহর। শহরটি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফলের জন্য বিখ্যাত। ইতিহাসবিদদের মতে, এ শহরের ইতিহাস ৪৫ শতাব্দী ধরে বিদ্যমান। আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে এখানে আরবের শাখা কেনানি ও জিবুতিদের বসবাস ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে তারা এখানে বসবাস করত এবং তারা দুর্গও নির্মাণ করেছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ১০৪৯ সালে শহরটি দাউদ আ.-এর হস্তগত হয় এবং তাঁর সন্তান সুলায়মান আ.-এর যুগে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে বুখতেনাসারের নেতৃত্বে শহরটি পারসিকদের আয়ত্তে আসে। তখন ইয়াহুদিদের পাইকারিহারে হত্যা করা হয় এবং অবশিষ্টদের দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার কর্তৃক এ অঞ্চল দখলে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি পারসিকদের অধীনে ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমানরা এ শহরের শাসনভার গ্রহণ করে।

প্রথম দিন থেকেই খ্রিষ্টবাদের ধ্বজাধারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেন এখানে ইয়াহুদি-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। তাই সুদূর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমেই এখানে ইয়াহুদি কমিশনার নিযুক্ত করে। কমিশনার নিযুক্ত হয়েই সে এ শহরকে ইয়াহুদিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। আমেরিকার খ্রিষ্টান সংস্থাগুলোও এ অঞ্চলে ইয়াহুদিদের জমি ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করে।

৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে পারসিকরা আবার এ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য অর্জন করে এবং সমস্ত গির্জা ধ্বংস করে দেয়। এটি ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ এবং তখন পারসিকদের এ বিজয়ে মক্কার কাফিররা উল্লসিত হয়েছিল এই ভেবে-তারাও মুশরিক, আমরাও মুশরিক। কিন্তু কুরআনে কারিমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দেই হিরাক্লিয়াস বাদশাহর হাতে অপ্রত্যাশিতভাবে পারসিকদের পতন ঘটে এবং সেখানে আবার খ্রিষ্টরাজ আরম্ভ হয়। উমর রা.-এর খিলাফতকালে প্রথমবারের মত জেরুসালেম শহরটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। আব্বাসি ও উমাইয়া শাসনামলে শহরটি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এগারো শতকে [৪৯২ হিজরি-১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ] ইউরোপের খ্রিষ্টানরা পুনরায় শহরটি দখল করে উমর রা.-এর বিপরীতে শহরবাসীর ওপর নির্যাতনের এমন স্টিমরোলার চালায়, যা মানবতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। অনেক মুসলমানকে মসজিদে আকসায় এনে জবাই করে হত্যা করা হয়। মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়ে ঠাট্টাস্বরূপ 'আস্তাবলে সুলায়মান' নামে ডাকা হতে থাকে। ৮০ বছর খ্রিষ্টানদের অধীনে থাকার পর ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের সাহসী সৈনিক সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাত ধরে এ শহর পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত হয়। তিনি মসজিদে আকসাকে পুনঃনির্মাণ করে সেখানে ব্যাপকভাবে মসজিদ, মাদরাসা ও ওয়াকফ অ্যাস্টেট প্রতিষ্ঠা করেন। এসবের ধারাবাহিকতা ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি ইংরেজরা শহরটিকে দখলের আগ পর্যন্ত বহাল ছিল।

হেবার্ট স্যামুয়েল নামে এক ইয়াহুদি ইংরেজদের পক্ষ থেকে এ শহরের প্রথম কমিশনার নিযুক্ত হয়। প্রথম দিন থেকেই খ্রিষ্টবাদের ধ্বজাধারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেন এখানে ইয়াহুদি-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। তাই সুদূর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমেই এখানে ইয়াহুদি কমিশনার নিযুক্ত করে। কমিশনার নিযুক্ত হয়েই সে এ শহরকে ইয়াহুদিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। আমেরিকার খ্রিষ্টান সংস্থাগুলোও এ অঞ্চলে ইয়াহুদিদের জমি ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করে। ধীরে ধীরে ইয়াহুদিরা শক্তি সঞ্চার করে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের সহায়তায় এ অঞ্চলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন অভিশপ্ত ইয়াহুদিরা বায়তুল মাকদিসকে করায়ত্ত করে। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়াসহ পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নতুন ইয়াহুদিরা এ শহরে আসছে।

এদের বাসস্থান নির্মাণে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ইয়াহুদিদের বসতি স্থাপন করা হচ্ছে। শহর বিনির্মাণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের অজুহাতে প্রতিনিয়ত প্রাচীন আরব ঐতিহ্য ও ইসলামি স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হচ্ছে। লাখ লাখ ফিলিস্তিনি নাগরিক ইয়াহুদিদের বিভিন্ন কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে নিজেদের গ্রাম-শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিনিয়ত তারা সিরিয়া লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থী হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে। হয়তো একদিন আল্লাহর কোনো নির্বাচিত বান্দা জিহাদি পতাকা নিয়ে এ পবিত্রভূমিকে তৃতীয়বার মুসলমানদের আয়ত্তে আনার স্বপ্ন বাস্তবায়ণ করবেন।

লেখক :
আলেম এবং বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক।

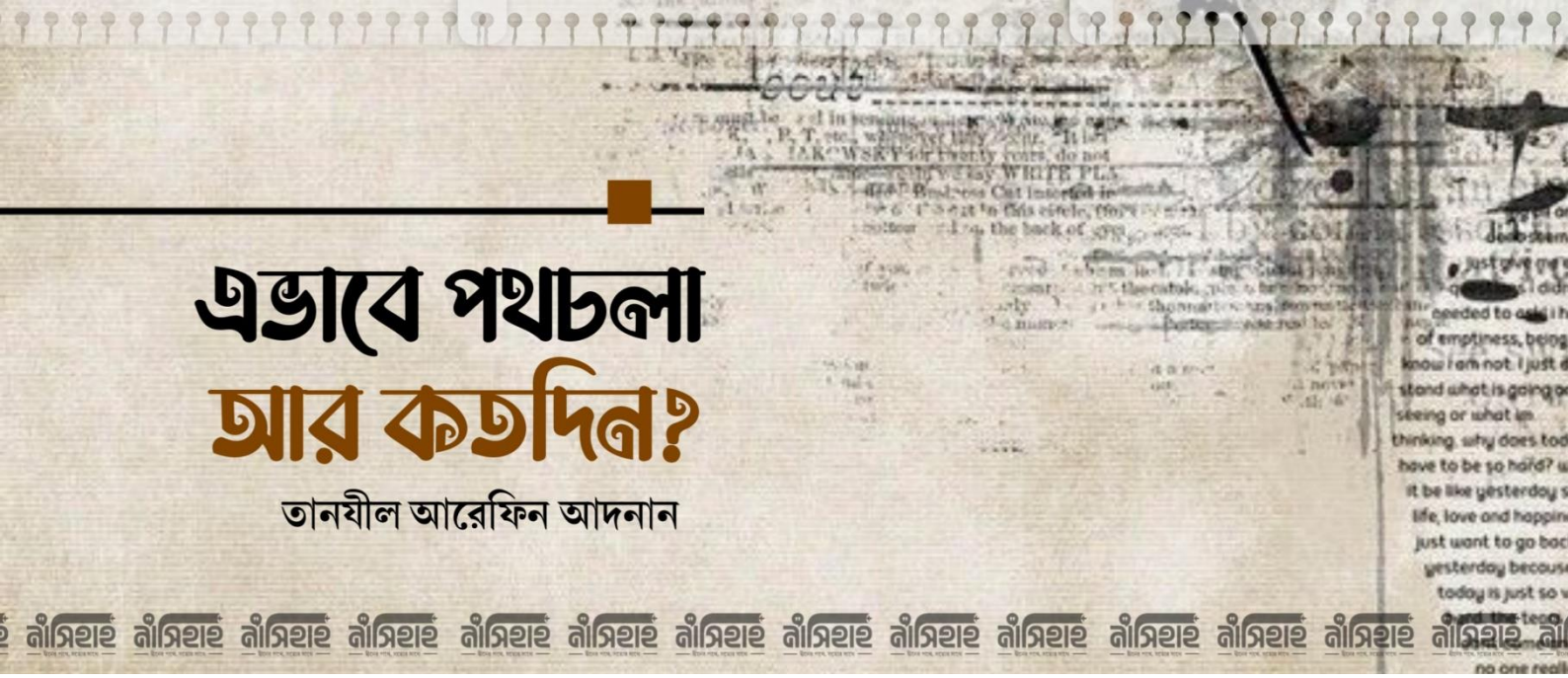

এভাবে পথচলা আর কতদিন?

তানযীল আরেফিন আদনান

এভাবে পথচলা আর কতদিন?

✍ মুফতি তানজীল আরেফিন আদনান

আল্লাহ তাআলা আমার-আপনার দুই চোখে ২৬ কোটি তার লাগিয়ে দিয়েছেন, যা দিয়ে আমরা দেখতে পাই। তিনি এর বিল নির্ধারণ করেছেন-হারাম বস্তুর দিকে তাকানো যাবে না, দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। কিন্তু কতজনই বা এই বিল ঠিকমতো আদায় করে? ভেবে দেখুন, কখনো কি একবারও তিনি একটি লাইন কেটে দিয়েছেন?

একভাবে না একভাবে জীবন চলে যাচ্ছে আমাদের, জীবন কখনো থেমে থাকে না। তবে পথটা হয়তো ভিন্নরকম হতে পারে। কারও পথ হয় মসৃণ, আর কারও পথ হয় দুর্গম, কণ্টকময়। জীবন-পথেও মানুষ অনেক রূপ-রেখার সম্মুখীন হয়। কারও জীবন কেটে যায় মসৃণভাবে, কোনো ঝায়ঝামেলা ছাড়াই, আর কারও জীবনের পথ যেন শেষ হতেই চায় না। এই বিপদ শেষ হলো তো আরেক বিপদ এসে ঘাড়ে চেপে বসল। যে পথেই মানুষ চলুক না কেন, মানুষের জীবন-ঘুড়ির নাটাই কিন্তু এক মহান সত্তার কাছেই রয়েছে। যে আকাশেই জীবন-ঘুড়ি ওড়াই না কেন, নাটাইয়ের সুতো একদিন হয়তো শেষ হবে, অথবা হ্যাঁচকা টানে ঘুড়ি ফিরে আসবে তার মালিকের কাছে। ঘুড়ির সাথে মানুষের জীবনের মিল হয়তো খুব কমই রয়েছে, কিন্তু এটা তো সত্য যে, আমাদের এই জীবন একদিন শেষ হবে, জীবনের পথে আমাদের এই পথচলা একদিন শেষ হবে, এই পথও একদিন ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আমি কি কখনো পেছনে ফিরে একবারও দেখেছি, আমার এই পথচলা মসৃণ পথে হচ্ছে না কি পথের পাশের কর্দমাক্ত স্থান দিয়ে হচ্ছে! আমি কি কখনো ভেবে দেখেছি, যে পথে আমার চলার কথা ছিল আমি কি সে পথে চলছি না কি ভুল পথে হাঁটছি অবিরাম! এই চলার পথে তো বিধি-নিষেধ খুব বেশি কিছু না- আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মানতে হবে, আর এ ক্ষেত্রে সহজের জন্য তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে।

ব্যাস! এই তো! খুব বেশি কষ্ট হয়ে যাবে? প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য ৪৫ মিনিট বা এক ঘণ্টা ব্যায় করা কি খুব কষ্টের কিছু? ধরুন আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, সেখানে নিয়ম হলো ৯-৫টা অফিস করতে হবে। এখন এই সময়ের মধ্যে আপনি সর্বোচ্চ আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা ফাঁকিবাজি করার সুযোগ পাবেন, এর চেয়ে বেশি হলে আপনার চাকরিই চলে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ ফুলটাইমের মধ্যে সামান্য সময় আপনি হয়তো অলসতা করতে পারবেন। তাহলে ভেবে দেখুন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। আমাদের মূল চাকরি হলো তাঁর ইবাদত করা। কিন্তু আমরা কি এই চাকরি ঠিকমতো করছি? বরং এর উল্টোটাই হচ্ছে, পুরো জীবন কাটাচ্ছি তাঁর অবাধ্যতায়, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে তাঁর ইবাদত করছি, আমাদের মূল চাকরি করছি। একটু ভেবে দেখুন, আপনার বাসার বিদ্যুতের বিল বকেয়া পড়ে গেলে বিদ্যুৎ-অফিস থেকে লোক এসে বিদ্যুতের লাইন কেটে দেয়। আল্লাহ তাআলা আমার-আপনার দুই চোখে ২৬ কোটি তার লাগিয়ে দিয়েছেন, যা দিয়ে আমরা দেখতে পাই। তিনি এর বিল নির্ধারণ করেছেন-হারাম বস্তুর দিকে তাকানো যাবে না, দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। কিন্তু কতজনই বা এই বিল ঠিকমতো আদায় করে? ভেবে দেখুন, কখনো কি একবারও তিনি একটি লাইন কেটে দিয়েছেন?

দুনিয়ার নিয়ম হলো, রুলস অমান্য করলে চাকরি চলে যায়, প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেয়। মনমতো না চললে মা-বাবাও দেখতে পারেন না। এমনকি ঠিকমতো সংসার চালাতে না পারলে ভালোবাসার বিবিও দেখতে পারে না। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ তাআলার এত অবাধ্যতার পরেও তিনি কখনো আমাদের রিযিক বন্ধ করে দেননি, কখনো এক বেলার জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করেননি। কখনো এক দিনের জন্য শরীর অবশ করে দেননি। কথা তো ছিল কবেই আমাদের ধ্বংস হওয়ার, কথা ছিল আল্লাহর আযাবে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার, কিন্তু এখনো আমরা কীভাবে টিকে আছি? কেন এখনো আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে? কেন এত অবাধ্যতার পরেও আমাদের রিযিক চালু রয়েছে? এর উত্তর একটাই, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভালোবাসেন।

আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমরা কী পরিমাণ লোক আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় প্রতি মূহুর্তে ডুবে আছি! বেশিদূর যেতে হবে না, নিজ মহল্লার মসজিদের আশেপাশেই দেখুন, মসজিদ-লাগোয়া বাজার, মার্কেট, দোকান বা বাসা-বাড়ির কতজন লোক জামাতের সাথে নামাজ পড়তে আসে? অথচ প্রতি ওয়াক্তে তাদের কানে আযানের ডাক আসে, প্রতি ওয়াক্তেই তারা মুয়াজ্জিনের ইকামত শুনতে পান, প্রতি ওয়াক্তেই তারা ইমাম সাহেবের দরাজ কণ্ঠে আল্লাহু আকবারের তাকবীর শুনতে পান। তবুও কত লোক মসজিদে আসে না! মসজিদের নিচের দোকানের লোকই তো মসজিদে আসে না! এসব লোকদের ব্যাপারে বিখ্যাত তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেছেন, **'যারা মসজিদের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও জামাতে নামাজ পড়ে না, এটাই তাদের মুনাফিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'**

শুধু এই একটি সমস্যাই নয়, এমন অসংখ্যা সমস্যায় জর্জরিত আমরা। অসংখ্য গুনাহ নিয়ে আমাদের সমাজ এখনো টিকে আছে। অথচ আমাদের কার্যকলাপে হিমালয়ের উঁচু শৃঙ্গও ভেঙ্গে পড়ার কথা ছিল। কথা ছিল সমুদ্রে আগুন লেগে যাওয়ার। মৃদু সমীরণের বদলে কথা ছিল তপ্ত লু হাওয়া বইবার। সবুজ-শ্যামল ফসলের মাঠ শুষ্ক

মরুভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল শহর-নগর সব উজাড় হয়ে যাওয়ার। অথচ এখনো আমরা দিব্যি টিকে আছি। এখনো আমাদের ওপর নেয়ামত বর্ষিত হচ্ছে। এখনো আমরা দুনিয়ার বুকে স্বগর্বে চলাফেরা করছি।

এভাবে প্রত্যেক সমস্যা ধরে ধরে লিখতে গেলে বিশাল পাণ্ডুলিপি হয়ে যাবে। এখানে শুধু বড় একটি সমস্যার কথা বলা হলো। এই হলো আমাদের পথচলার অবস্থা! এভাবে পথচলা আর কতদিন! এবার তো ফেরা উচিত। আর কতদিন সঠিক পথ থেকে বিমুখ হয়ে থাকব, এবার তো আল্লাহমুখী হওয়া উচিত। এভাবে আমরা নিজেরা তো ধ্বংস হয়েছিই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ধ্বংসের পথে বাড়িয়ে দিচ্ছি। আমি যখন এই লেখাটা লিখছি, ঠিক তখনই ফেসবুকে একটি ভিডিও দেখতে পেলাম, টাঙ্গাইল সদরের একটি মসজিদের আঙিনাতে ব্যান্ড মিউজিকের কনসার্ট হচ্ছে। মসজিদ থেকে দু' কদম হাঁটলেই কনসার্ট, এদিকে মসজিদে মাগরিবের নামাজ হচ্ছে, ওদিকে বড় বড় সাউন্ডবক্সে গান বাজছে। আচ্ছা এই কনসার্টে যেসব তরুণ-তরুণীরা উপস্থিত রয়েছে, তাদের সবাই কি কাফের-মুশরিক? নাহ, বরং তাদের অধিকাংশই মুসলিম ঘরের সন্তান। তারাও নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। তাহলে এই প্রজন্ম ধ্বংস করেছে কে? ফিরআউন? না কি আবু জাহাল? নাহ, তাদের পরিবার, তাদের মা-বাবা, তাদের সমাজ, তাদের ফ্রেন্ড সার্কেল তাদেরকে ধ্বংস করেছে। তারাই তাদেরকে এভাবে জাহান্নামের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে।

এভাবে আর কতদিন! এভাবে পথচলাই বা আর কতদিন! চারদিকে দেখি আর আফসোসের ভারী নিশ্বাস ফেলি। আমরা শুধু দেশ ও সমাজের আর্থিক উন্নতি-অবনতিটাই দেখি, এটাকেই প্রচার করি, অথচ আমার দেশে, আমার সমাজ, আমার পরিবার যে সেই কবেই ঈমান-আমলের ক্ষেত্রে ধ্বংসের মুখে রয়েছে, এ ব্যাপারে আমার কোনো হুঁশ নেই। এই অধঃপতন শুধু একজন ব্যক্তির নয়, বরং পুরো দেশ এর ফল ভোগ করে।

প্রকাশ্যে গুনাহের সয়লাব এখন। সগিরা আর কবিরা গুনাহের ভেদাভেদ নেই। হারাম বলতে কোনো শব্দই বোধহয় দুনিয়াতে নেই এখন। দ্বীনের ধ্বজাধারী ব্যক্তিও মোবাইলে খেলা দেখছে, নাটক দেখছে, বেগানা নারীর ভিডিওযুক্ত কৌতুক দেখছে, মিউজিকসহ কোনো ভিডিও দেখছে; অথচ এর সবগুলো কবিরা গুনাহ! পাঁচ ওয়াক্তের মুসুল্লিও নামাজ শেষে বাসায় গিয়েই টুপি খুলে টিভির সামনে বসে পড়ছেন। মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেটের সামনেই মিথ্যা বলছেন, গীবত করছেন! ইসলামিক মোটিভেশনাল ভিডিও দেখার নামে প্রতিনিয়ত আমরা মিউজিকসহ ভিডিও দেখছি, আবার চোখের পানিও ফেলছি! ভাবির সাথে পর্দা, মামীর সাথে পর্দা, খালাত, ফুফাত, চাচাত, মামাত ভাই-বোনের মাঝে পর্দার বিধান যেন আল্লাহ কখনোই পাঠাননি! দাড়ি-টুপি ওয়ালা লোকটাও ভাবির সাথে একসাথে খাবার খাচ্ছে! দ্বীনদার ছেলেটাও মামীর আদর নেয়ার ভান করে গায়ে গা মেলাচ্ছে! ভাবির সাথে ফোনে কথপোকথন, কাজিনদের শাসনের নামে তাদের সাথে ওঠাবসা, তাদের সাথে আপন ভাইবোনের মতো আচরণ করা যেন আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মিথ্যা আর গিবত নামে যে দুটো বড় বড় কবিরা গুনাহ আছে এটা যেন মানুষ ভুলেই গিয়েছে! ওয়াদা পালন করা, আমানতের হেফাজত করার হুকুম যেন দ্বীন থেকে উঠে গিয়েছে! নামাজ ভঙ্গ করার ব্যাপারে ধমকিযুক্ত হাদীসগুলো যেন বুখারী-মুসলিম থেকে মুছে গিয়েছে। সুদ-ঘুস হারাম হওয়ার আয়াত সম্ভবত

নবীজির ইন্তেকালের পরেই মানসুখ হয়ে গিয়েছে! অহেতুক ছবি আর সেলফি তোলার মতো হারাম বিষয় আজ মুস্তাহাব বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কোথাও যাব আর সেলফি তুলব না, তা হয় নাকি! তাহলে তো আমি আল্লাহ ওয়ালাই হতে পারলাম না! এদেরকেই আবার আমরা দ্বীনদার ভাবছি, এদের থেকেই দ্বীন শিখছি। আমরা এখন আখেরি মালহামা নিয়ে বেশ চিন্তিত। আখেরি মালহামা সংক্রান্ত ভিডিও দেখছি হারাম মিউজিকসহ! খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. এর বীরত্বের বয়ান শুনছি মিউজিকসহ! এত কিউট জাতীতে আমরা পরিণত হব ভাবতেও পারিনি। এ জাতি ধ্বংসের আর কী কী উপকরণ বাকি রেখেছে বলুন! এখনো জমিনে টিকে আছি এটাই তো ভাগ্যের ব্যাপার!

ইয়া আসাফা! ইয়া আসাফা!

পরিশেষে আবারও বলছি, এভাবে পথচলা আর কতদিন! আমরা স্বপ্ন দেখি, আমাদের ভূখণ্ডেও একদিন ইসলামী খিলাফাহ কায়েম হবে, তখন এসব প্রকাশ্য গুনাহের সয়লাব কমতে বাধ্য হবে। অন্তত মানুষ বুঝবে, শরীয়তের হুকুম কোনটা। আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের শাসক, আমাদের বিচারক আর কুরআন-সুন্নাহের সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া ধ্বংসের পথে আমাদের এই পথচলা কখনো থামবে বলে মনে হচ্ছে না। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। আমীন। ■

লেখক :
মুহাদ্দিস, জামিয়া রাহমানিয়া দারুল উলূম, কাজলা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

হে মরুফুল! হে রাসূল! সীরাতপাঠে আপনার ছবি আঁকতে আঁকতে আমি হয়রান। মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোলাকার মীমে যাই আটকা পড়ে। দেখা হয়না আপনার হাস্যোজ্জ্বল মুখ। যে মুখের অমায়িক হাসিতে যেন স্বর্গের পারিজাত পুষ্পের পুষ্পবৃষ্টি হতো যমিনে। লিখে যেতো হাসসান আপনার শান আনমনে। কে আপনি, যার জন্য আমার মনের বদ্ধ দোয়ার খোলে হৃদমাজারে উঁকি দেয় ইশক? আপনি কি সে–ই যার চাহনি দেখেই ক্ষুধা মিটে যেতো উপবাসীদের? হৃদয়ে জেগে উঠতো ইশকের বারিধারা? গাইতো নরম-কোমল-মোলায়েম সুরে দুরূদের গান? অনিন্দ্যসুন্দর চাহনির অধিকারী? যাতে আঘাত হানতো তীর; প্রেম বিদারী? আপনি তো অতলান্ত অন্ধকারে নক্ষত্ররাজির ন্যায় দীপ্তিমান আলোকের সন্ধান। যার চরিত্রের বর্ণনা মহমান্বিত কুরআন। আপনি তো মহান প্রভূর করুণার ফল্গুধারা বহনকারী। অশান্ত হৃদয়ে শান্তি বিতরণকারী। পৃথিবীকে সতেজ-সজীবকারী; যাতে টকটকে রক্তিম গোলাবও ছিলো ঝকঝকে ধূসর। আপনি সাহিত্যলংকারের স্রোতস্বিনীতে শব্দে শব্দে কল্লোল ধ্বনি তুলা উম্মী মানব। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে জমে থাকা সমস্ত প্রেম আপনার তরে নিবেদন করলাম। দূর বিদেশের দূরত্ব আমায় মোটেও পীড়া দেয় না। আমি প্রেমিকের মাকান দূরত্ব থাকা স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে নিয়েছি। আমার ক্বলব আপনাতেই ভরপুর। প্রেমিকের ক্বলবেই আপনার অবস্থান। কোনো এক চন্দ্রিমার আলোতে ভরপুর রাতে আপনার দীদারে ধন্য হতে চায় এ উন্মাদ, ছন্নছাড়া, অযোগ্য, যাযাবর গোলাম। ফিদাকা নাফসি ইয়া রাসুলুল্লাহ! সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মুজাহিদ আল হাসান।
শিক্ষার্থী, মুহাম্মাদিয়া দারুস সুন্নাহ আহমদাবাদ কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

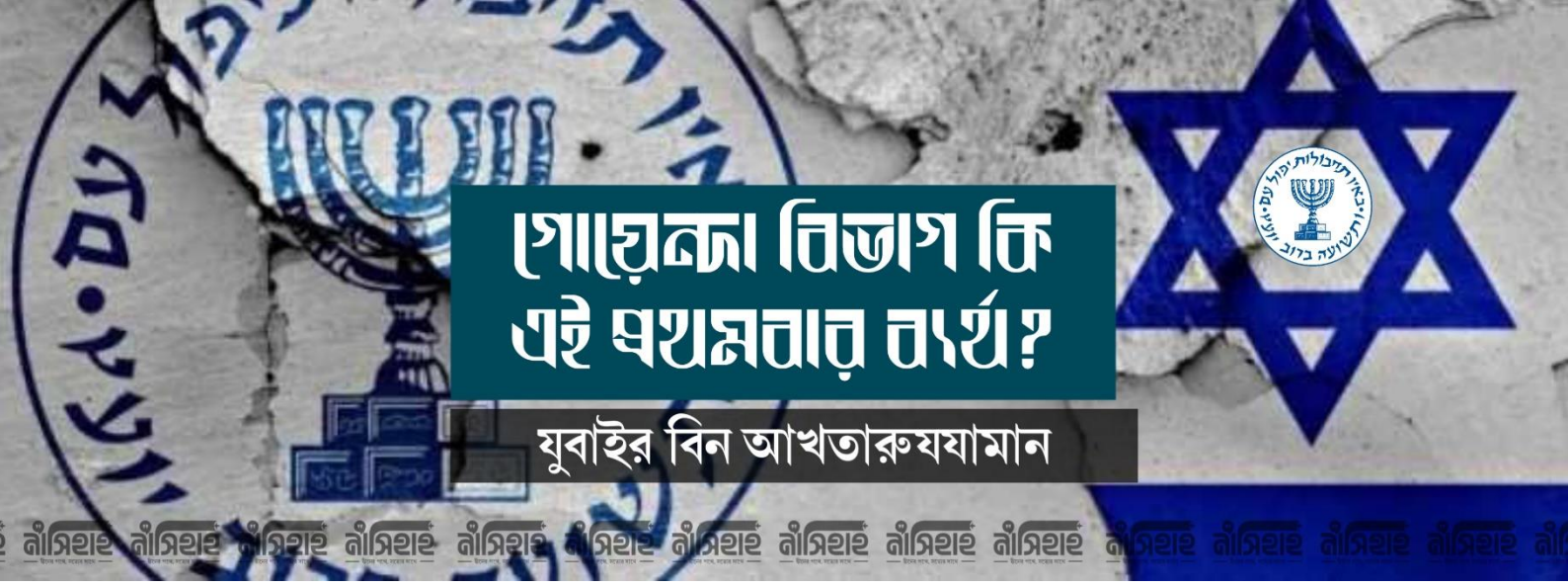

গোয়েন্দা বিভাগ কি এই প্রথমবার ব্যর্থ?

✍ মাওলানা যুবাইর বিন আখতারুযযামান

হালের আল কাসসাম ব্রিগেডের সেনাপ্রধান মুহাম্মদ দেইফের কথাই ধরুন। তিনি তো গাজার এক সমাবেশে প্রকাশ্যে ইজরাইলকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, 'আজকে আমি বাড়ি যাব। পারলে আমায় হত্যা করে দেখাও?' তিনি তো তার অবস্থানের কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন। তবে আজ পর্যন্ত মোসাদ কেন ব্যর্থ?

কিছু কিছু ফিতনাচারী বক্তা বা চিন্তাবিদ আছেন যাদের ষড়যন্ত্রতত্ত্ব শুনে রীতিমত অবাক হতে হয়। 'ফিতনাচারী' বলতে যারা ফিতনার কথা বলে নিজেরাই তাতে নিপতিত হন। এমনই একজন বক্তার আলোচনা শুনলাম। তিনি ইজরাইল ও মোসাদের ব্যাপারে সুউচ্চ ধারণা রাখেন যে, তারা সবই জানে। হামাসের এই হামলার ব্যাপারেও জানত তবে তারা আক্রমণ করতে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থের জন্য। তিনি খুব চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আপনারা কী ভাবেন, মোসাদ এগুলা কিছুই জানে না? তাদের এত এত গোয়েন্দা বিভাগ তারা কিছুই টের পায়নি? তারা জানে।' তো এই লোকের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হচ্ছে, সে আল্লাহর থেকে মোসাদের উপর বেশি বিশ্বাস রাখে। তার জ্ঞানগত অবস্থা নিয়েও আমি সন্দিহান। নিজের পিত্তি জ্বালায়েন না আগেই। কথা শেষ করতে দেন। প্রশ্ন হলো, মোসাদ ও আমেরিকার ঝানু ঝানু গোয়েন্দারা কি আজকে প্রথম ব্যর্থ? এর উত্তর হচ্ছে, না। মোসাদ শুরু থেকেই হামাসের কাছে ব্যর্থ। মোসাদের ব্যর্থতাই আজকের শক্তিশালী হামাস তৈরি করেছে।

একটু পেছনে ফিরে যাই। ঘটনা শুরু ১৯৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। কাক ডাকা ভোরের ঘটনা। আম্মানের রাবিয়া এলাকায় অবস্থিত ইজরাইলি দূতাবাস থেকে দুটি হুন্ডায় চারজন কিডন ইউনিটের সক্রিয় সদস্য জর্ডানের শুমায়সানি হামাস নেতা খালিদ মিশালের বাড়িতে যাচ্ছে। 'কিডন' বেয়োনেটের হিব্রু পরিভাষা।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রমের দেখভাল করে থাকে কিডন ইউনিট সদস্যরাই। মূলত এরা ইসরাইলের চিহ্নিত শত্রুদের গোপনে হত্যার মিশন বাস্তবায়ন করে। মোসাদের সেদিনের অভিযান মিশালের বাসা অভিমুখে। প্রথম গাড়ির চারজনের একজন ড্রাইভার, একজন নিরাপত্তাকর্মী আর দুজন হিটম্যান। দুই হিটম্যানের নাম জন কেনডাল (২৮) এবং ব্যারি বেডস (৩৬)। তাদের উপরই হত্যা মিশনের মুল দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এই দুই আততায়ী ঘটনার মাত্র একদিন আগে কানাডার পাসপোর্ট নিয়ে জর্ডানে প্রবেশ করে। কিডন সদস্যদের ভাড়া করা গাড়ি পুরোটা পথই মিশালকে অনুসরণ করে। কূটনৈতিক প্লেট লাগানো গাড়ি নিকটস্থ মক্কা সড়কে অবস্থান নেয়। মিশাল গাড়ি থেকে নেমে অফিস ভবনে প্রবেশ করার পর আততায়ী কেনডাল এবং বেডস তার পেছনে ছুটে যায়। একজন আততায়ীর হাতে একটি ডিভাইস ছিল; হাত ব্যান্ডেজ করে নিয়েছিল বিধায় বাইরে থেকে তা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু এই দুই আততায়ী খেয়াল করেনি মিশালের গাড়িতে তখনও দেহরক্ষী আবু সাইফ বসা। প্রথম আততায়ী পেছন থেকে এসে তার হাতের ডিভাইস খালিদ মিশালের বাম কানে লাগিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে এক সাক্ষাতকারে মিশাল জানিয়েছেন- যন্ত্রটি কানে লাগানোর সাথে সাথে তার মনে হয়েছিল তিনি প্রচন্ড জোরে বৈদ্যুতিক শক খেয়েছেন। যন্ত্রটি আসলে কী ধরনের ছিল- তা তখনও জানা যায়নি। তবে মিশাল সেই যাত্রায় বেঁচে যান। তার দেহরক্ষী নেমে সেই দুই ইজরাইলি আততায়ীকে ধাওয়া শুরু করে। মিশালের গাড়িচালক তড়িঘড়ি করে তাকে অফিসে নিয়ে যায়। আবু সাইফ সেদিন প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার পরেও অনেকটা পথ দৌড়ে নিজের দক্ষতা এবং পথচারীদের সহযোগিতা নিয়ে সেই দুই আততায়ীকে ধরতে পেরেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাকে সাহায্য করেছিলেন জর্ডানস্থ ফিলিস্তিনি লিবারেশন আর্মির কর্মকর্তা সাদ নাইম আল খতিব; যিনি ঘটনাচক্রে সেদিন আবু সাইফের তাড়া করার সময়ে ঐ সড়কে তাকে দেখতে পান এবং সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ধস্তাধাস্তির এক পর্যায়ে আবু সাইফের মাথায় একজন আততায়ী ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে মাথা ফেটে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণও হয়।

ইতোমধ্যে খালিদের শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই খালিদ মিশালের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। সহকর্মীরা দ্রুততার সাথে তাকে জর্ডানের ইসলামিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুপুর ১টা ২০-এ হাসপাতালে পৌঁছিয়ে তিনি জ্ঞান হারান। হাসপাতালের প্রাথমিক পরীক্ষাতেই বুঝা গেল, মিশালের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। এদিকে হামাসের নেতা খালিদ মিশালের উপর হামলা হয়েছে- সেই খবর ততক্ষণে পুরো জর্ডানসহ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলের এবং ইখওয়ানের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ মিশালকে দেখতে হাসপাতালে চলে আসেন। জর্ডান ইখওয়ান নেতা এবং তৎকালীন জর্ডান পার্লামেন্টের সদস্য ড. আব্দুল্লাহ আল আকাইলাহ সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগও শুরু করে দেন। তার তৎপরতায় গোটা ঘটনাটি জর্ডানের বাদশাহ হোসেনকে জানানো হয়।

হাসপাতালে যখন এই পরিস্থিতি, তখন পুলিশের কাস্টডিতে থাকা দুই আততায়ীর অবস্থা একেবারেই অন্যরকম। কানাডীয় পাসপোর্টধারী আটক দুই ব্যক্তি জানান- তারা সাধারনভাবেই পর্যটক হিসেবে ঘুরাফেরা করছিলেন। আবু সাইফ

কোনো উস্কানি ছাড়াই তাদের উপরে চড়াও হয়েছে। পুলিশের দায়িত্বরত কর্মকর্তা তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে জর্ডানস্থ কানাডা দূতাবাসে ফোন দেন এবং দুই কানাডীয় পাসর্পোটধারী আটকের বিষয়টি তাদেরকে অবহিত করেন। তারা কানাডা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের দ্রুত জর্ডান পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। কিছুক্ষণ পরই দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা পুলিশ স্টেশনে হাজির। কিন্তু সেই কূটনৈতিক কর্মকর্তা ও পুলিশেরা সবাই পরবর্তী ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যান। আটক দুই ব্যক্তি প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শুরু করে। তারা পুলিশ বা দূতাবাসকে কোনো সহযোগিতা করতে কিংবা নিতে অস্বীকার করেন। আদতে জর্ডানস্থ মোসাদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই আক্রমণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতেন। তিনি মূলত গোটা আক্রমনের পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করছিলেন। যখনই এই দুই আততায়ী ধরা পড়ে যায়, তখন পেছনের গাড়িতে থাকা ব্যাকআপ টিম সাথে সাথেই স্পট থেকে সরে যায় এবং সরাসরি ইজরাইলি দূতাবাসে গিয়ে মোসাদের সেই কর্মকর্তাকে হত্যা মিশন সম্পর্কে জানায়। মিশনের ব্যর্থতা এবং দুই গোয়েন্দার ধরা পড়ে যাওয়ার তথ্য ব্যাকআপ টিমের মাধ্যমেই মোসাদের ওই কর্মকর্তা জানতে পারেন। তিনি জর্ডানের তথ্যমন্ত্রী সামিহ আল বাত্তিখিকে তাৎক্ষণিক সরাসরি ফোন দিয়ে বলেন, আটককৃত দুই ব্যক্তি মোসাদের এজেন্ট এবং তাদেরকে যেন কোনো হয়রানি না করা হয়। তিনি আরও জানান, ইজরাইলি সরকার খুব সহসাই বাদশাহ হোসেনের সাথে যোগাযোগ করবে।

হামাস নেতা খালিদ মিশালের উপর আক্রমনের ঘটনা বাদশাহ হোসেনের কানে এসে পৌছায়। সাথে সাথেই তিনি পুরো বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব নেন। এরই মধ্যে আটক দুই মোসাদ সদস্য স্বীকার করে- তারা খালিদ মিশালকে হত্যা করার জন্যই এসেছিল এবং ইতোমধ্যে তারা মিশালের উপর এক ধরনের বিষ প্রয়োগ করেছে। বাদশাহ হোসেন সাথে সাথেই খালিদ মিশালকে ইসলাম হাসপাতাল থেকে আল হোসেন মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। সেখানে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক খালিদ মিশালকে পরীক্ষা করেন এবং অবস্থার উন্নয়ন কীভাবে করা যায়- সেটা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। শুধু তাই নয়, বাদশাহ হোসেন সেই সময়গুলোতে নিজের ক্যান্সার চিকিৎসা করাচ্ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মায়ো ক্লিনিকে। তিনি মিশালের চিকিৎসার জন্য সেই মায়ো ক্লিনিক থেকেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে আসেন। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও জর্ডানের ভূখণ্ডে ইজরাইল যেভাবে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, সে প্রসঙ্গে তিনি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে সরাসরি ফোন দিয়ে অবহিত করেন। তিনি বিল ক্লিনটনকে বলেন, 'আপনি ইসরাইলের উপর চাপ দিন যাতে তারা জানায় যে, খালিদ মিশালের উপর তারা কোন ধরনের বিষ প্রয়োগ করেছে। আর তাদের কাছে এর প্রতিষেধক থাকলে, তা দেওয়ার জন্য আপনি ইজরাইলকে অনুরোধ করুন।'

মিশালকে হত্যার প্রয়াস সম্পর্কে জর্ডানের বাদশাহ হোসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে ফোনে বিস্তারিতই খুলে বলেন। ক্লিনটন শুনে অবাক হয়ে যান। বিশেষ করে জর্ডানে এমন হামলা হতে পারে, তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হোসেনের সাথে কথা বলার শেষ দিকে ক্লিনটন রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'That man is impossible। এখানে

'ইমপসিবল' শব্দটির অর্থ 'অসম্ভব' নয়, বরং 'অসহনীয়'। এটা বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুঝাতে চাইলেন, উগ্রপন্থী ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর এসব কাজ আর সহ্য করা যায় না। তিনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

খালিদ মিশালকে হত্যা করতে গিয়ে মোসাদ ভালোই চাপে পড়ে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭। খালিদ মিশালের হত্যা প্রচেষ্টার ৫ দিন অতিবাহিত হয়েছে। বাদশাহ হোসেন জর্ডানের জারকা এলাকায় এক জনসমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি তার ভাষণে ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে কার্যকর কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার স্পষ্ট আহবান জানান। খালিদ মিশালের চিকিৎসায় ইজরাইল সহায়তা না করলে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাবে। তিনি পারস্পরিক ভরসা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিলম্বে শেখ আহমেদ ইয়াসিন এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তি দাবি করেন। অন্যথায় ইজরাইলকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে দৃঢ় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

৫ অক্টোবর ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকার একটি প্রেস রিলিজ ইস্যু করে- যেখানে তারা প্রথমবারের মত জর্ডানের আম্মানে হামাস নেতা খালিদ মিশালকে হত্যা প্রচেষ্টার বিষয়টি সরাসরি স্বীকার করে নেয়। ইসরাইল এই হত্যা প্রচেষ্টার পুরো দায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করার পর জর্ডান কর্তৃপক্ষ তাদের দেশে আটক হওয়া মোসাদের ঐ দুই এজেন্টকে ছেড়ে দেয়। এই ব্যাপারে একটি প্রেস রিলিজে জর্ডান সরকার জানায়, ইজরাইলের সাথে চুক্তির অংশ হিসেবে সেদিন ইজরাইলের বিভিন্ন কারাগার থেকে জর্ডান ও ফিলিস্তিনের ৪০ জন বন্দিকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

উল্লিখিত বক্তার সুপরিচিত গোয়েন্দা বিভাগ মোসাদ হামাস নেতা খালিদ মিশালকে হত্যা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ ইয়াসিনকেই মুক্ত করতে বাধ্য হলো। খালিদ মিশালের জন্য চিকিৎসা পাঠাতে বাধ্য হলো। এবার বলুন তাদের গোয়েন্দা বিভাগ কেন সফল হলো না?

হালের আল কাসসাম ব্রিগেডের সেনাপ্রধান মুহাম্মদ দেইফের কথাই ধরুন। তিনি তো গাজার এক সমাবেশে প্রকাশ্যে ইজরাইলকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, 'আজকে আমি বাড়ি যাব। পারলে আমায় হত্যা করে দেখাও?' তিনি তো তার অবস্থানের কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন। তবে আজ পর্যন্ত মোসাদ কেন ব্যর্থ? এখন অবশ্য তিনি ইতর মুনাফিকদের মতো হামাসকেই ইজরাইলের চ্যালা-পেলা বলতে পারেন।

তাদের কথা দূরে থাক। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমরকে কে না চেনে? তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা ও আধ্যাত্মিক নেতা মোল্লা উমর ছিলেন আমেরিকার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকার অন্যতম। ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে আক্রমণ চালানোর পরও মোল্লা উমরকে খুঁজে পায়নি। মোল্লা উমরের মাথার দাম ছিল ১০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু অত অর্থের লোভেও কেউ তাকে ধরিয়ে দেয়নি। মজার ব্যাপার হলো, তিনি যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সে বাড়িতে একাধিকবার তল্লাশি চালিয়েছিল সুপারপাওয়ার খ্যাত আমেরিকা। তাদের সেনাঘাঁটির খুব কাছে ছিল মোল্লা উমরের আত্মগোপনের জায়গা। দিন-রাতে বহু বোমারু বিমান বাড়ির উপর দিয়ে গেলেও বোমা হামলা করেনি। এখন হয়তো তারা বলতে পারে ছাত্ররা তো আমেরিকারই তৈরি বোমা মারবে কেন? তারা যাই বলুক বস্তবতা সবাই জানে। মানুষ ভুলে যায় আলোর নিচে অন্ধকার থাকে। ●

লেখক :
আলেম ও নবীন ইতিহাস গবেষক।

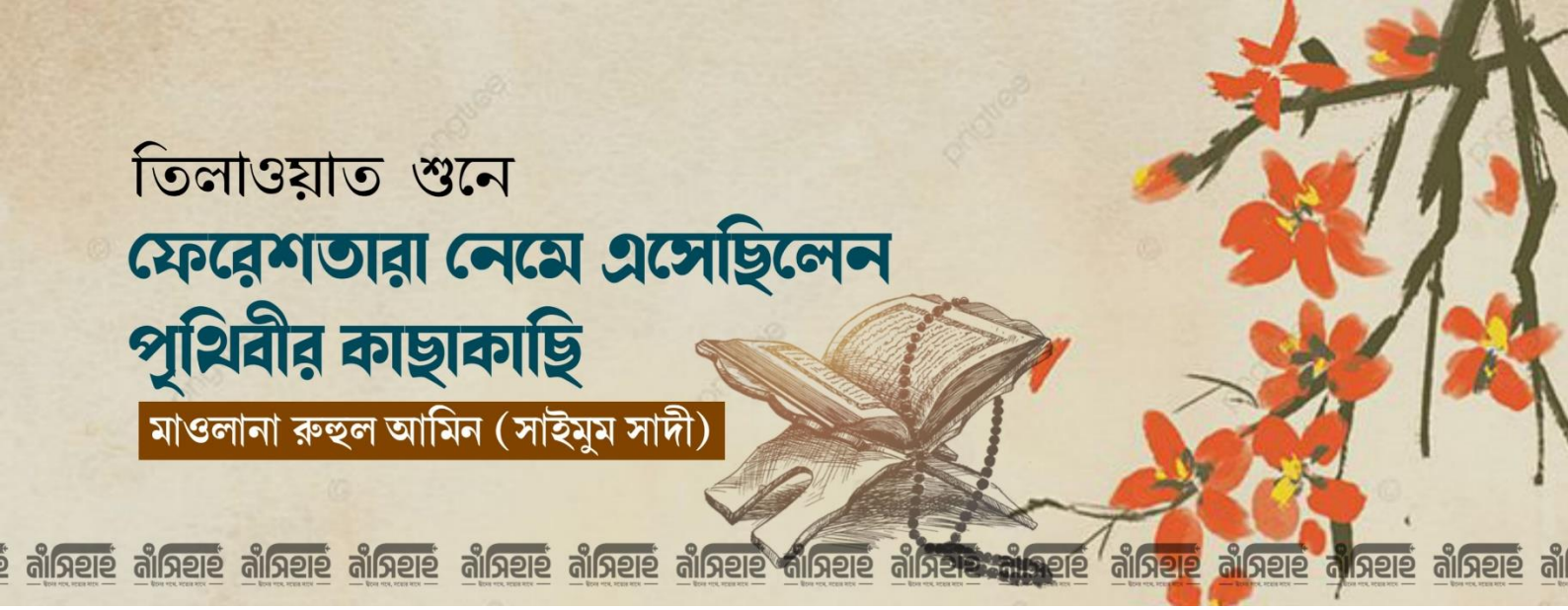

তিলাওয়াত শুনে
ফেরেশতারা নেমে এসেছিলেন পৃথিবীর কাছাকাছি

মাওলানা রুহুল আমিন (সাইমুম সাদী)

তিলাওয়াত শুনে
ফেরেশতারা নেমে এসেছিলেন পৃথিবীর কাছাকাছি

মাওলানা রুহুল আমিন (সাইমুম সাদী)

চারিদিকে বালু আর বালু। দিনে বালুরাশি আগুনের মতো গরম হয়ে উঠে। রাতে কিছুটা ঠাণ্ডা হয়। মরুভূমির এলাকার মানুষজন– তাই দিনে ঘর থেকে বেরোয় কম। রাতে বের হয় বেশী। একটি ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি। বাড়ির সাথে লাগানো একটি আস্তাবল এবং কয়েকটি খেজুরের বাগান নিয়ে চমৎকার একটি জীবন অতিবাহিত করেন নবীজীর (ﷺ) সাহাবী হজরত ওসাইদ ইবনে হুজাইর। দিনে মহানবী (ﷺ)-এর দরবারে বসে থাকেন। নবীজির মুখ নিঃসৃত বাণী শুনেন। শোনেন সদ্য নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআনের আয়াত। কুরআনের পবিত্র বাণী মুখস্থ করেন এবং রাতে তা তিলাওয়াত করেন বারংবার। কুরআনের আয়াত যত তিলাওয়াত করেন ততই ভাল লাগে। দিনে তার সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় হচ্ছে নবীজির সাহচর্য, আর রাতে পবিত্র কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত। রাত যত গভীর হয় তেলাওয়াতের সুর মাধুর্য ততই ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে দূরে। বালিয়াড়ির স্তুপ পেরিয়ে অজানা গন্তব্যে। প্রতিধ্বনিত হয় পাহাড় থেকে পাহাড়ে। ওসাইদ আকাশের দিকে তাকালেন। পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্ররাজির মেলা বসেছে যেন। তারার রুপোলি আলোয় অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে আকাশ। নক্ষত্র-মুদ্রিত আকাশের অনেক নিচে পৃথিবীতে তখন বয়ে যাচ্ছে মধ্যরাতের স্নিগ্ধ বাতাস। পাশে খর্জুর বিথীর পাতায় বাতাস লেগে বেজে উঠা মরমর শব্দ এক বেহেশতি আবহ তৈরি করছে।

ওসাইদের মন আকুল হয়ে উঠল পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের জন্য। তিনি শুরু করলেন কোরআন তেলাওয়াত, আলিফ লাম মিম...। কিন্তু তেলাওয়াতের এই নিমগ্নতায় ব্যাঘাত ঘটালো ঘোড়ার চিৎকার এবং অস্থিরতা। তিলাওয়াত বিঘ্ন ঘটালো ঘোড়া। তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন ওসাইদ। ঘোড়াটি নিরব হয়ে গেল।

ওসাইদের মন আকুল হয়ে উঠল পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের জন্য। তিনি শুরু করলেন কোরআন তেলাওয়াত, আলিফ লাম মিম...। কিন্তু তেলাওয়াতের এই নিমগ্নতায় ব্যাঘাত ঘটালো ঘোড়ার চিৎকার এবং অস্থিরতা। তিলাওয়াত বিঘ্ন ঘটালো ঘোড়া। তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন ওসাইদ। ঘোড়াটি নিরব হয়ে গেল। ঘোড়া নীরব হলে তিনি আবার শুরু করলেন তিলাওয়াত। এবার ঘোড়াটি পূর্বের তুলনায় আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠলো এবং চক্কর দিতে লাগলো। তিনি তিলাওয়াত থামিয়ে দিলেন। ঘোড়াটি নীরব হয়ে গেল। ঘটনাটি কয়েকবার ঘটল। তিনি তিলাওয়াত শুরু করলেই ঘোড়াটি লাফিয়ে ওঠে। তিনি নীরব হলে ঘোড়াটি শান্ত হয়ে যায়।

একটু দূরে ঘুমিয়ে আছে ওসাইদের সন্তান ইয়াহইয়া। ঘোড়াটি কোনভাবে তাকে পদদলিত করে ফেলার ভয়ে উসাইদ ইয়াহিয়াকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য এগিয়ে গেলেন এবং সেসময় তিনি দেখতে পেলেন সবচাইতে সুন্দর দৃশ্যটি। দেখলেন মাথার ওপরে আকাশের কোণায় ঝুলে আছে তাঁবুর মত মেঘখণ্ড। এত সুন্দর মেঘের ভেলা তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। লণ্ঠনের মত অগণিত বাতি ঝুলে আছে সেখানে। সেই বাতিগুলো থেকে এক অপার্থীব ধরনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। ওসাইদ অবাক নয়নে তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। মেঘখণ্ড আকাশে উড়তে উড়তে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ভোরবেলা মহানবী (ﷺ)-এর দরবারে গেলেন এবং রাতের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন মহানবী (ﷺ) বললেন, ওসাইদ তা ছিল একটি ফেরেস্তার দল। তারা তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। যদি তুমি তেলাওয়াত বন্ধ না করতে তাহলে ভোরবেলা পৃথিবীর সকল মানুষ তাদেরকে দেখতে পেত। ■

✍ **লেখক :** আলেম ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

রোযনামচা

চাঁদনী রাতে দাদুর গল্প

অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষার পর সবেমাত্র ছুটি হল। আর কত পড়তে মন চায়। ভালো লাগেনা। মনমরা হয়ে সময় কাটাচ্ছে রাফি। সন্ধ্যায় বাবা ফিরে এসে বলল, রাফি! রাফি! কোথায় তুমি? আগামী বৃহস্পতিবার তোমাকে নিয়ে রাঙ্গামাটির সাজেকে যাব। যেখানে মেঘের দেশ। গতকাল বিকেলে জার্নি করে ঢাকা থেকে রাফিরা সাজেক পৌঁছালো। সাজেকের মূল আকর্ষণ পাহাড়-পর্বত, আর মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়ানো। বিকাল বেলায় তারা সাজেকের এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখল। মাগরিবের নামাজ শেষে স্নিগ্ধ চাঁদের জ্যোৎস্না কার না ভালো লাগে। ঝুলন্ত হোটেলের বারান্দায় পরিবারের সকলে মিলে বসলো গল্প করতে। রাফি বলে উঠলো দাদু! আমাদের বিজ্ঞানে মেঘ চক্র নিয়ে অনেক পড়েছি। কাল সকালে সেই স্বপ্ন সত্যি রূপে বাস্তবায়ন হবে। পৃথিবীর ভারসাম্যের জন্য এই পাহাড়গুলো কার্যকর– যা আমাদের বিজ্ঞানে পড়েছি দাদু । রাফি! আমার দাদু ভাই! তুমি কি মহান রবের সৃষ্টি সম্পর্কে জানো! বিজ্ঞানের এ আবিষ্কারের চৌদ্দ শত বছর পূর্বেই পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা এসব জানিয়েছেন। দেখ দাদু ভাই পানি, বৃষ্টি ও বায়ু সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি দেখনি আল্লাহ মেঘমালা হাঁকিয়ে নেন, তারপর তাকে পুঞ্জিভূত ঘনঘটায় পরিণত করেন। তারপর তোমরা তার ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হতে দেখ।' (আন-নূর : ৪৩)। আবার দেখো পাহাড় নিয়ে কি বলা হয়েছে, 'তিনি পাহাড় গুলোকে খুঁটি রুপে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা নাবা : ৭)। দেখছো না দাদু আজকের আকাশটা কত সুন্দর লাগছে, এই চাঁদের স্নিগ্ধতা দিয়ে। তুমি কি জানো এই চাঁদ-সূয-তারকারাজি নিজ কক্ষপথে সব সময় ঘুরতে থাকে! দেখ, কুরআন কী বলে, 'কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র।' (আল-ফুরকান : ৬১)। দাদু শুনে রাখ, এই পৃথিবীকে দেখে দেখে যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে না পারো তাহলে এ জীবনের মূল্য নেই। যদি আজকের এই সফর থেকে মহান রব কে চিনতে পারি তাহলেই আমাদের এই আনন্দ সার্থক হবে। ●

✍ **লেখক : তাসনীম হোসেন,** শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

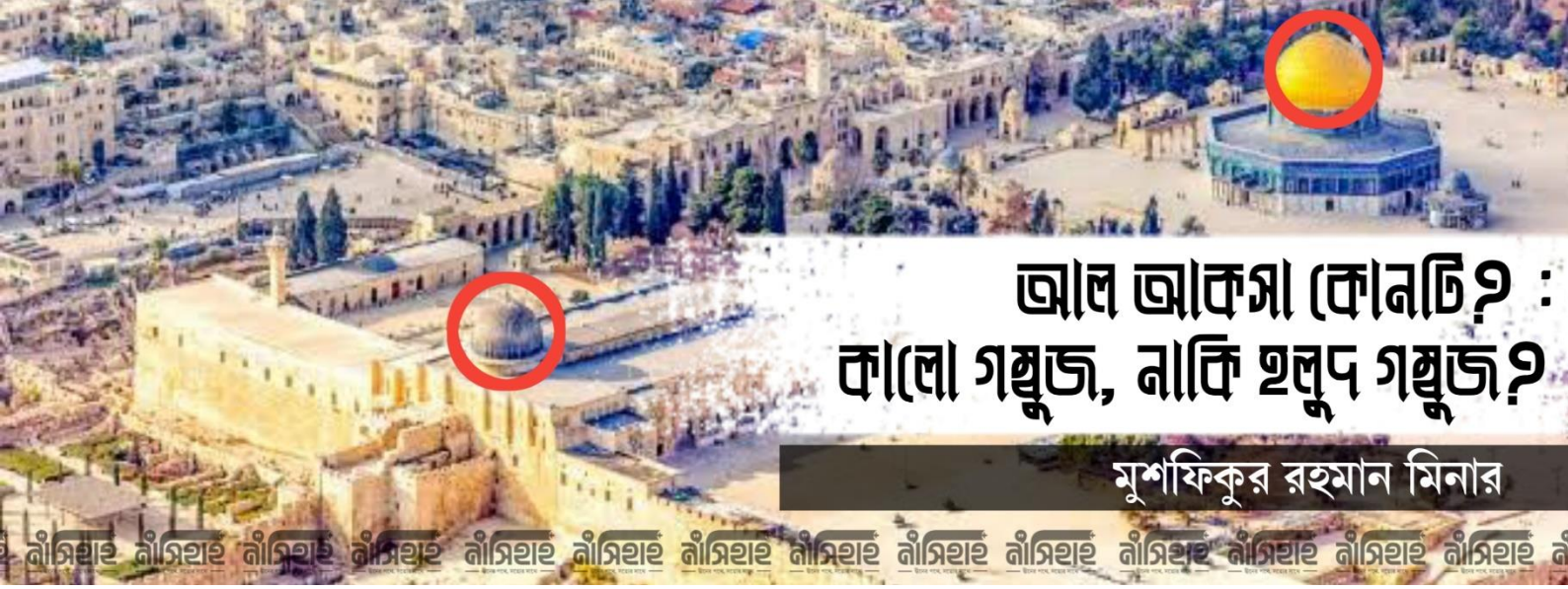

আল আকসা কোনটি?

কালো গম্বুজ, নাকি হলুদ গম্বুজ?

✍ মুশফিকুর রহমান মিনার

ফিলিস্তিন বিষয়ক কোন ইস্যু সামনে এলেই সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন মাধ্যমে একটা কথা খুব ভাইরাল হয়– হলুদ গম্বুজের মসজিদটা নাকি মসজিদুল আকসা না, কালো গম্বুজের মসজিদটাই নাকি আল আকসা। 'ষড়যন্ত্র' করে নাকি ভিন্ন মসজিদকে আল আকসা বলে চালানো হয়! অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, অধিকাংশ মুসলিমেরই ধারণা নেই **'মসজিদুল আকসা'** আসলে কী। আমরা কোনটা 'ষড়যন্ত্র' আর কোনটা 'অজ্ঞতা' সেটাই বুঝি না। তাই ভুলভাল তথ্যে ভরা ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো ভাইরাল হয়।

'মসজিদুল আকসা' যে আসলে কী, সেটা কুরআনেই আছে। আমরা খেয়াল করে পড়ি না বিধায় বুঝি না। কালো গম্বুজের মসজিদটা প্রথম নির্মাণ করেন উমার (رضي الله عنه), তাঁর খিলাফতকালে ফিলিস্তিন বিজয়ের পরে। হলুদ গম্বুজের মসজিদটা (কুব্বাতুস সাখরা/Dome of Rock) নির্মাণ করেন উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান, ৭২ হিজরিতে।[1] এর একটা মসজিদও রাসুল (ﷺ) এর জীবদ্দশায় ছিলো না। অথচ মেরাজের রাতে রাসুল (ﷺ) মসজিদুল আকসায় গিয়েছেন বলে কুরআনে উল্লেখ আছে!

> *"পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[2]*

মসজিদুল কিবলি, কুব্বাতুস সাখরা, মসজিদুল বুরাক এই সবগুলোই 'মসজিদুল আকসা' এলাকার মধ্যে অবস্থিত। কারো কারো একটি ভুল ধারণা আছে যে মসজিদুল কিবলি (কালো গম্বুজের) বুঝি একমাত্র মসজিদ (আল আকসা)। এমন ধারণা সঠিক নয়। পুরো এলাকাটিই মসজিদ (আল আকসা)। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোনো ইমারত না, বরং পুরো এলাকাটিই 'মসজিদুল আকসা'।

[1] https://islamqa.info/en/20903/

[2] আল কুরআন, বনী ইস্রাঈল (ইসরা) ১৭ : ১

সুতরাং, কালো গম্বুজ বা হলুদ গম্বুজ– এই দুই মসজিদ নির্মানেরও আগে থেকে 'মসজিদুল আকসা' ছিল বলে আল কুরআন থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে! 'মসজিদুল আকসা' তাহলে কোনটা? শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন, "মসজিদুল আকসা সেই পুরো এলাকার নাম, যেখানে সুলাইমান (عليه السلام) মসজিদ বানিয়েছিলেন।"[3]

ফিলিস্তিন বিষয়ক বিশ্বকোষ 'আল-মাউসুআতুল ফিলাসতিনিয়্যাহ'তে বলা হয়েছে, "মসজিদুল আকসা" এই নামটি ঐতিহাসিকভাবে পুরো হারাম শরিফ এলাকাটিকে এবং এর মাঝের ইমারতগুলোকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।"[4]

Islamqa (Hanafi) ওয়েবসাইটের এক ফতোয়াতে অনেক পূর্বযুগের উলামার রেফারেন্স উল্লেখ করে বলা হয়েছে, Masjid al-Aqsa covers one-sixth of the south east area of old Jerusalem. The whole area within the compound walls (a total area of 1,44,000 m2) is Masjid al-Aqsa. Masjid al-Qibli, Dome of the Rock, Masjid al-Buraq are all inside the compound of Masjid al-Aqsa. Some people have a misconception that Masjid a-Qibli is only the Masjid. This is incorrect. The entire compound is a Masjid.

অর্থ : পুরাতন জেরুজালেমের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এলাকার ৬ ভাগের ১ অংশ জুড়ে মসজিদুল আকসা অবস্থিত। সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পুরো এলাকাটিই (মোট ১,৪৪,০০০ বর্গমিটার) 'মসজিদুল আকসা'। **মসজিদুল কিবলি, কুব্বাতুস সাখরা, মসজিদুল বুরাক এই সবগুলোই 'মসজিদুল আকসা' এলাকার মধ্যে অবস্থিত। কারো কারো একটি ভুল ধারণা আছে যে মসজিদুল কিবলি (কালো গম্বুজের) বুঝি একমাত্র মসজিদ (আল আকসা)। এমন ধারণা সঠিক নয়। পুরো এলাকাটিই মসজিদ (আল আকসা)।**[5] **অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোনো ইমারত না, বরং পুরো এলাকাটিই 'মসজিদুল আকসা'।** এর মাঝের যে কোনো ইমারত বা মসজিদ, খালি জায়গা– সবই 'মসজিদুল আকসা'র অন্তর্ভুক্ত। ঠিক যেমন মক্কায় মসজিদুল হারাম একটা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এই এলাকার মধ্যে কাবা ঘর আছে, ইমারত আছে, খালি জায়গাও আছে। এই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সবটাই 'মসজিদুল হারাম'। মসজিদুল আকসার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। রাসুল (ﷺ) ইসরা-মিরাজের রাতে যখন মসজিদুল আকসায় গিয়েছিলেন, তখন কিন্তু সেখানে কোনো ইমারত ছিলো না। সীমানাপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা খালি স্থানটিই ছিলো মসজিদ।[6] ঐ স্থানেই বহুকাল পূর্বে সুলাইমান (عليه السلام) এবং বনী ইস্রাঈলের নবীদের মসজিদ ছিলো। মসজিদুল আকসা এলাকার মধ্যেই উমার (رضي الله عنه) একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। সেই মসজিদেরই বর্তমান রূপ কালো গম্বুজের মসজিদটি। এই মসজিদটি উমারী মসজিদ ও কিবলি মসজিদ নামে পরিচিত। হলুদ গম্বুজের মসজিদটির নাম কুব্বাতুস সাখরা (Dome of Rock)। উমারী মসজিদ, কুব্বাতুস সাখরা– উভয়ই মসজিদুল আকসা

[3] মাজমু'আতুর রাসাইল আল কুবরা ২/৬১

[4] মাউসুআতুল ফিলাসতিনিয়্যাহ ৪/২০৩

[5] https://islamqa.org/hanafi/askimam/127616

[6] এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, সেই খালি জায়গা যদি মসজিদুল আকসা হয়, তাহলে ইসরা-মিরাজের পরে রাসুল(ﷺ) এর কাছে কুরাঈশরা কোন 'দরজা'র কথা জিজ্ঞেস করেছিলো যদি সেখানে তখন কোনো মসজিদের ইমারত না থেকে থাকে? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে : সেখানে পুরো আল আকসা এলাকা যে সীমানাপ্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল, সেই সীমানাপ্রাচীরের দরজার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে দলিলসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এখানেঃ https://is.gd/2yRYYs

এলাকার মাঝে। কাজেই এর যে কোনোটিতে সালাত আদায় মানেই 'মসজিদুল আকসা'তে সালাত আদায় করা। এমনকি ঐ এলাকার মাঝের খালিও জায়গায় সালাত আদায় করলেও তা 'মসজিদুল আকসা'তে সালাত আদায় রূপে গণ্য হবে। বাইতুল মুকাদ্দাস/বাইতুল মাকদিস কথাটি মসজিদুল আকসাকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়।

The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA) থেকে প্রকাশিত ট্র্যাভেল গাইডেও জনসাধারণের এই ভুল ধারণার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ট্র্যাভেল গাইডের ৪-৫ নং পৃষ্ঠায় পুরো আল আকসা এলাকার ছবি উল্লেখ করে এর নিচে বলা হয়েছে–

Al-Aqsa Mosque is often confused with the silver domed Al-Qibly Mosque which from an Islamic point of view is incorrect as it comprises the entire compound.

কাজেই ফেসবুক বা অন্যান্য স্থানে যেভাবে বলা হয়, কালো মসজিসদটাই 'আসল' আল আকসা মসজিদ, অন্য মসজিদটা না!" - এমন কথা নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত। উভয় মসজিদই আল আকসা এলাকার ভেতরে। আফসোসের বিষয় হলো আমরা জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন বিজয় করতে চাই অথচ আল আকসা মসজিদ কী এটাই জানি না! আমাদের প্রথম কিবলা যে কেমন ছিলো এই ধরণের বেসিক জ্ঞানই আমরা অনেকে আজ পর্যন্ত অর্জন করিনি। ●

✍ **লেখক :**
নাস্তিক-বিরোধী লেখক ও কলামিস্ট।

অভিমত

উন্মুক্ত মাদরাসা

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা সবাই জানি। যারা শৈশবে পড়াশোনা করতে পারেনি বা নিম্ন মধ্যমিক থেকেই ঝড়ে গেছে; এখন নতুন করে পড়াশোনা করার ইচ্ছে হয়েছে, জ্ঞান অন্বেষণের জন্য আবার পড়াশোনা করতে চায়– তাদের জন্য পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার একটি দারুণ প্লাটফর্ম হল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে কোন বয়সের সীমাবদ্ধতা নেই। যে কোন বয়সের যে কেউ চাইলে পড়াশোনা শুরু করতে পারে। মূল কথায় আসি, ইদানীং একটা বিষয় সমাজ খেয়াল করলেই দেখবেন পারবেন, যুবকদের মধ্যে খুব বেশি ইসলাম চর্চা হচ্ছে। অনেক যুবক আছে যারা এক সময় দাড়ি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, এখন নিজেরাই দাড়ি রাখছে। মসজিদে গেলে বয়বৃদ্ধদের থেকে যুবকের সংখ্যায় বেশি চোখে পড়ে। এ বিষয়টাকে আপনি কী ভাবে দেখেন? খেয়াল করলেই দেখবেন, যুবকরা ইসলামিক কালচারও গ্রহণ করছে। এই সময়ে যুবকদের ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার জন্য, শিখার জন্য, আমাদের সুযোগ করে দেওয়া উচিৎ বলে মনে করি। বহু যুবক-যুবতী ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে বেইমানদের সাথে মিশে ইমান হারা হচ্ছে, নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে অহরহ। যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন, মাশা-আল্লাহ তারা দীন সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখেন। কিন্তু যাদের ইসলামিক কোন প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞান নেওয়ার সুযোগ হয়নি, তাদের বড় বেহাল দশা। তাদের জন্য যদি আমরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উন্মুক্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করি, তাহলে ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে। হয়তো প্রথমেই রাষ্ট্রীয়ভাবে হবে না; কওমি মাদ্রাসাও তো রাষ্ট্রীয়ভাবে চলে না– নিজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে চলে। একইভাবে যদি, উন্মুক্ত মাদ্রাসা নিয়ে ইসলামিক স্কলারগণ, সমাজের আলেম-ওলামা ও দ্বায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ ভাবেন, তাহলে হয়তো এদেশে কোন মুসলিম যুবক অন্তত নাস্তিক হবে না। গ্রামে এবং শহরে, কোচিং সেন্টারের মতো করেই শুরু করতে পারি। নির্দিষ্ট একটা ফি নিয়ে চালু করা যেতে পারে। শুধু দরকার উদ্যেগের। যদি শুধু ইসলামিক জ্ঞান থাকে; আমল কম করুক, বা বেশি করুক, ঈমান হারা হবে না। -ইনশাআল্লাহ

✍ **শাহজালাল,**
লেখক ও কলামিস্ট।

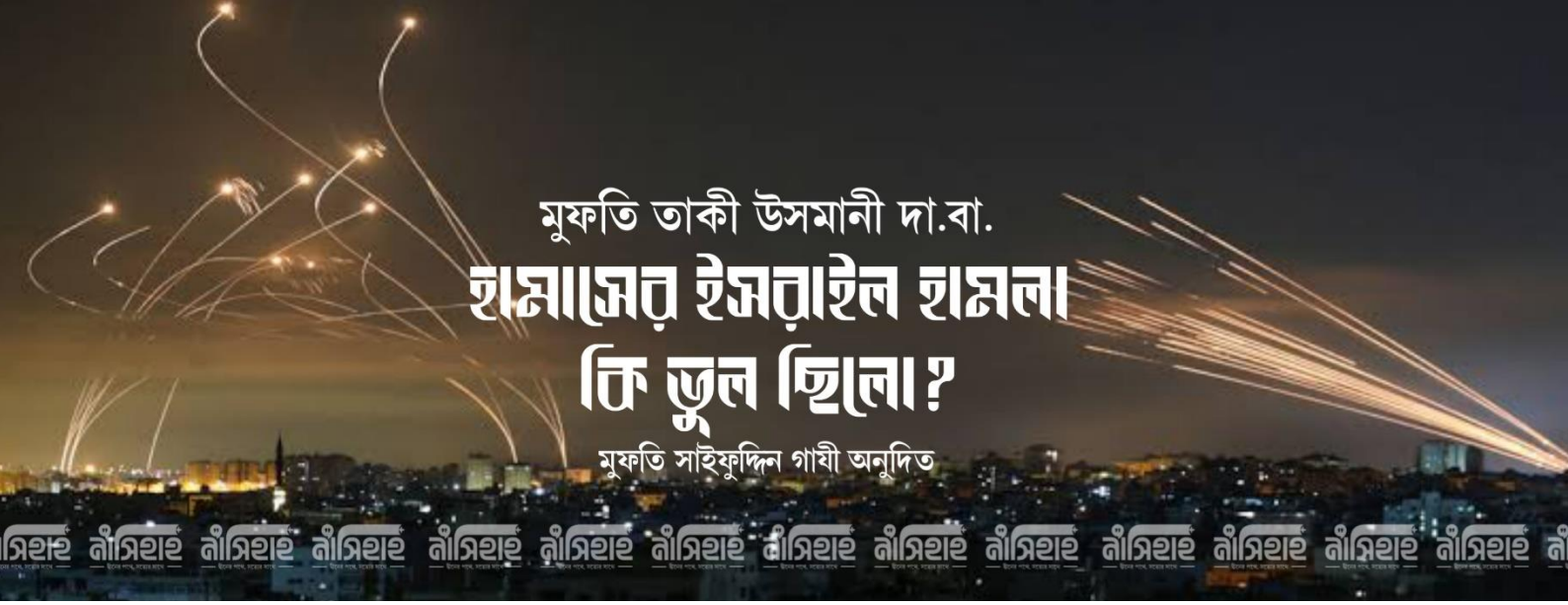

শাইখুল ইসলাম হাফিযাহুল্লাহ্-এর টুইট

হামাসের ইসরাইল হামলা কি ভুল ছিল?

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী

হামাস এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে, যদি একবার ইসরাইল মুসলিমবিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়, তখন এই দানব তার সর্বশক্তি দিয়ে আসল রূপে আবির্ভূত হবে। তখন একে প্রতিহত করার আর কোনো উপায় থাকবে না। আর এভাবে ইসরাইল শক্ত হয়ে গেলে তাদের আসল লক্ষ্য গ্রেটার ইসরাইল প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাবে, যে কারণে মুসলিমবিশ্ব আরও বিপদের মুখে পড়বে।

ইসরাইল ও পশ্চিমা মিডিয়ার প্রোপাগাণ্ডার কারণে হামাসের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী একটি ভুল বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক সাধারণ মানুষ ও নিরপেক্ষ দেশ সে প্রোপাগাণ্ডার শিকার হয়ে হামাসকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে। বার্তাটি হলো- হামাস কেন গায়ে পড়ে ইসরাইলের ওপর হামলা করতে গেল? হামাসের কী প্রয়োজন ছিল আগবাড়িয়ে এভাবে হামলা করার? যদ্দরুণ গাজ্জায় এই মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। হামাস নিজেও জানে, ইসরাইল তার চাইতে শতগুণ বেশি শক্তিশালী। শুধু তাই নয়, বরং আমেরিকা-ব্রিটেনসহ সমগ্র পশ্চিমাবিশ্ব ইসরাইলের সঙ্গে রয়েছে। হামাসের না শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা আছে, না অন্য কিছু। হামাসের পক্ষে কয়েকটি রকেট হামলা করে ওদের পরাজিত করা কি সম্ভব? এমতাবস্থায় ইসরাইল হামলা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে? হামাসের সাম্প্রতিক হামলাকে অনেকেই আত্মঘাতি ও আত্মহত্যার শামিল মনে করেন। আসলে বিষয়টি কি এমন? হামাসের হামলার পেছনে নৈপথ্য কারণ কি? হামাসের হামলা করা কি ভুল ছিল? বিষয়টি বুঝতে হলে আগে ফিলিস্তিন সংকট বুঝতে হবে।

ইসরাইলের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই, না এটি স্বতন্ত্র কোনো শক্তি। বরং এটিকে সর্বপ্রকার শক্তি দিয়ে সুসজ্জিত করে মুসলমানদের বুকের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কেবল ফিলিস্তিন নয়, বরং ইসলামী বিশ্বের বুকের ওপর তাদের

ভাষায়– এক অপরাজেয় শক্তির উদ্ভব ঘটানো, যার মাধ্যমে মুসলমানদের দমিয়ে রাখা যায়। হাজারো নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, মুসলমানদের নিজ ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করে এবং নানারকমের নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে 'দাইরে ইয়াসীন' এ ১৯৪৮ সালে এই বিষবৃক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর নানা ফন্দী-ফিকির ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, ইসরাইলের অস্তিত্ব যেন স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং রাষ্ট্র হিসাবে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মিশর, জর্দানসহ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র তাদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন তারা মুসলিমবিশ্বের কেন্দ্রভূমি সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বীকৃতি আদায়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। একবার যদি তারা সৌদি আরব থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়, তা হলে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো তাকে অস্বীকৃতি জানানো কঠিন হয়ে পড়বে। ইসরাইল চূড়ান্ত চক্রান্তে মেতে ওঠেছে, যেকোনো উপায়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে তার অবৈধ জন্মের বৈধতা আদায় করে ছাড়বে।

বিষয়টি এমন নয় যে, হামাস হঠাৎ হামলা করে বসেছে। বরং জন্মলগ্ন থেকেই ফিলিস্তিনী মুসলামনের ওপর ইসরাইলী বর্বরতার এক কালো অধ্যায় রচিত হয়ে আছে; যা কারও অজ্ঞাত নয়। এর পরে বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনো জায়গায় কোনো ছুতোয় মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করে আসছে। হামাস এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে, যদি একবার ইসরাইল মুসলিমবিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়, তখন এই দানব তার সর্বশক্তি দিয়ে আসল রূপে আবির্ভূত হবে। তখন একে প্রতিহত করার আর কোনো উপায় থাকবে না। আর এভাবে ইসরাইল শক্ত হয়ে গেলে তাদের আসল লক্ষ্য গ্রেটার ইসরাইল প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাবে, যে কারণে মুসলিমবিশ্ব আরও বিপদের মুখে পড়বে। এজন্য হামাস চিন্তা করলো, -আল্লাহু আ'লাম- যদি এ মুহূর্তে কোনো কার্যকরী আঘাত করা যায়, তা হলে মুসলিমবিশ্বের সাথে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের যে গোপন প্রক্রিয়া চলছে, অন্তত তা থেমে যাবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। তাদের এ পদক্ষেপের কারণে মুসলিমবিশ্ব নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করেছে এবং স্বীকৃতির যে প্রক্রিয়া চলছিল, তা থেমে গেছে। এটা তাদের প্রথম বড় অর্জন। তারা ভেবেছে, মরতে যখন হবে, তবে কেন লড়াই করে সসম্মানে মরবো না? কেন একজন বীরমুজাহিদের মতো মরবো না। এজন্য তারা হামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটা যদিও কতক বিবেকপূজারির কাছে বোধগম্য নয়, তথাপি যাদের জীবনের লক্ষ্য আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণের সম্মান লাভ করা, তাদের পক্ষে এমন পদক্ষেপ যথার্থ ও সঠিক। এতে ভুলের কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাপী ইসরাইলের সম্পর্কে যে অপরাজেয় ভাবমূর্তি ও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তৈরি হয়ে আছে, হামাস একটি ফলপ্রসূ হামলার মাধ্যমে তা চূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। যদি তারা দৃঢ়তার সাথে এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং মুসলিমবিশ্ব তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে, তথা সহায়তা করে, তা হলে আল্লাহর রহমতে এটি একটি সিদ্ধান্তমূলক চূড়ান্ত যুদ্ধ সাব্যস্ত হতে পারে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইসরাইলী দানব থেকে ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দান করবেন।

অনুবাদক : মুফতি সাইফুদ্দীন গাযী
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহ্ আমিশাপাড়া, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।

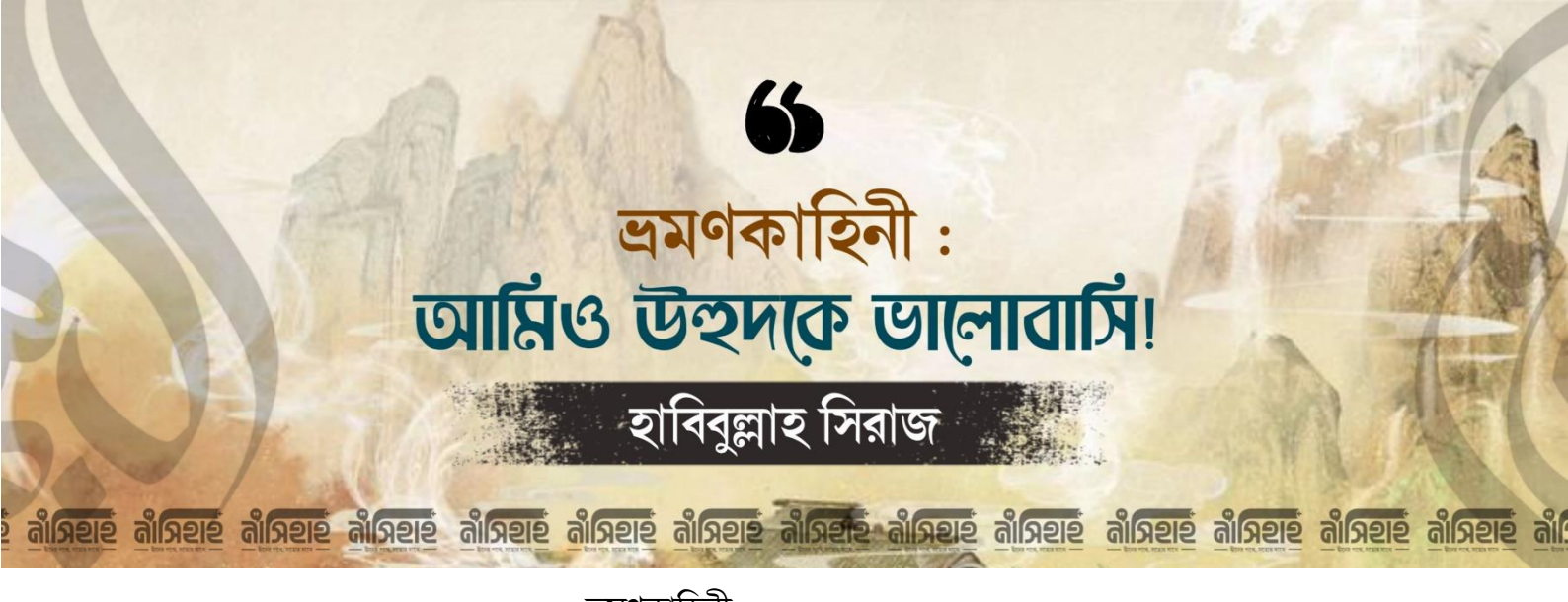

ভ্রমণকাহিনী :
আমিও উহুদকে ভালোবাসি!
হাবিবুল্লাহ সিরাজ

ভ্রমণকাহিনী :
আমিও উহুদকে ভালোবাসি!
✍ মুফতি হাবিবুল্লাহ্ সিরাজ

আছি উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে। একদিকে উহুদের বিস্তীর্ণ ময়দান। যে ময়দানের প্রতি ইঞ্চি মাটি সাহাবীদের রক্তযুক্ত। মিশ্রিত সরদারে দু'জাহান রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর দান্দান মুবারকের রক্ত কণিকা। একদিকে স্রোতহীন বয়ে চলা হাজার বছরের পুরাতন একটি খাল। যে খালটি দিয়ে পশ্চাৎপদতা অবলম্বন করে খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলমানদের উপর আকস্মিক হামলা পরিচালনা করেছিলেন। অন্যদিকে ৬০জন সাহাবীর শাহাদাতসিক্ত মৃতবাগান। সাথে আছে হযরত আমির হামযা (رضي الله عنه)-এর সমাধি। একটি অপার্থিব ভালোলাগা বিরাজ করছে চারদিকে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই আছে পাহাড়, পাহাড়ের উপর দাঁড়ালে দূরের মদীনাটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কল্পনায় হানা দেয় হাজার বছরের আগের অজস্র স্মৃতিসম্ভার। উহুদের সাথে আমার পরিচয় সেই নাহবেমির পড়াকালীন। যখন সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া পড়ি। তখন থেকেই উহুদের প্রতি ভালোবাসা হৃদয়ের বিহ্বলতা কাজ করছে। সেই কচি বয়সে হৃদয়ের নিষ্পাপ মাটিতে কল্পনার সুতো দিয়ে অঙ্কন করে রেখেছিলাম উহুদদের কাহিনী সংলাপ। আল্লাহ বহু বছর পর সেই কল্পনা বাস্তবায়ন করে দিয়েছেন। শোকরিয়া মাওলা তোমার। যখনই উহুদদের কাহিনী পড়তাম বা শুনতাম তখনই উহুদকে হৃদয়ের আকর দিয়ে হৃদয়ের ক্যানভাসে আঁকতাম। মদীনা থেকে সোজা পূর্বদিকে তাকালে উহুদ আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে।

> *৭০জন সাহাবীর আরামগাহের সামনে দাঁড়ালেই আপনার আমূল পরিবর্তন হবে। ভেতর থেকে চিৎকার আসবে– তারা কই, আর আপনি কই। একটি বেহেশতি আবেশ-মোহনমায়া আপনাকে আকড়ে ধরবে। আপনার তনুমন নরম হয়ে পড়বে। সাহাবিদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও স্বর্গীয় সৌরভ আপনাকে আচ্ছন্ন করবে।*

এখনো সেই পনের শত বছরের বর্ণেরঙে স্থির দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টি। মনে হবে উহুদ-কাণ্ডটি গতকালের। এখনো গন্ধ ছড়ায়, বিলাপ জাগায় হৃদয়ে; কারো চোখে কারো বা প্রাণে। যদিও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আপনাকে মুহূর্তেই উহুদের পাদদেশে পৌঁছে দিবে, কিন্তু বাস্তবে আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে পনের শত বছর আগের রক্তগল্পে। এখন উহুদের পাদদেশে একটি মসজিদ রয়েছে। নাম– **মসজিদে সাইয়িদুশ শুহাদা**। আধুনিক স্থাপত্যশৈলির শ্রেষ্ঠ উপহার মসজিদটি। ভিতরটা পিলারহীন বিশাল নামাযগাহ। মোটা-মোলায়েম কার্পেট। সর্বক্ষণ হিমশীতল বয়ে চলা সমীরণ। আপনাকে স্বাগত জানাবে অনেক বাঙালী পরিচ্ছন্নকর্মী। বাঙালীদের অনেকেই একটি নির্মল হাসি দিয়ে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। চারদিকে আগুনসমেত রোদ। তবে হাত বাড়ালেই পাবেন একদম পিউর ঠাণ্ডা পানি। নানান জন নানান কোম্পানি ফ্রি পানি বিলাচ্ছে। হাজি হাজি ডাকে আপনাকে আপন করে তুলবে অজানা-অচেনা কোনো কোনো আরব।

নামাযান্তে উত্তর দিকে গেইট দিয়ে বের হবেন। সামনেই ময়দান। বিস্তীর্ণ মরুভূমি। যদিও এখন গাড়ি পাকিংয়ের জন্য, দর্শকদের সুবিধার জন্য ময়দান নানান কাজে ব্যবহার হয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে, তবুও বেশ বড়সড় একটি ময়দান। তারপর দেয়াল ঘেরা কবরস্থান। কবরস্থান বললে ভুল হবে ৭০জন সাহাবীর আরামগাহ। শাহাদতের অমীয় সুধাপানে চিরসুখ নিদ্রায় শয়নে আছেন তাঁরা। আপনি সেখানে দাঁড়িয়ে আরবী নোটিশগুলো পড়া কিংবা কারো মুখ থেকে শোনার সাথে সাথে কেঁদে দিবেন নিশ্চিত। না, একটুও বানিয়ে বলিনি। ৭০জন সাহাবীর আরামগাহের সামনে দাঁড়ালেই আপনার আমূল পরিবর্তন হবে। ভেতর থেকে চিৎকার আসবে– তারা কই, আর আপনি কই। একটি বেহেশতি আবেশ-মোহনমায়া আপনাকে আকড়ে ধরবে। আপনার তনুমন নরম হয়ে পড়বে। সাহাবিদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও স্বর্গীয় সৌরভ আপনাকে আচ্ছন্ন করবে।

আমি সেখানে একটি ইরাকি পরিবার দশের কম বয়সের দুটি ফুটফুটে মেয়েসহ দেখেছি। পরিবারের অন্যদের সাথে অঝোর ধারায় বাচ্চা দু'টিও কাঁদতে শুরু করলো। অথচ তারা ইতিহাসের আগাগোড়া তেমন কিছুই বুঝে না। কার সহ্য হবে, ৭০জন সাহাবীর রক্ত বিলানোর এ ঘটনা মনে পড়লে? মুসলিম বলতেই 'আহ' একটা শব্দ বের হয়ে আসবে হৃদয়ের গভীর থেকে। তারপর চলবেনসেই পাহাড়ের দিকে; হাদিসের পাতায় যে পাহাড়ের নাম জাবালে রুমা অর্থাৎ তিরান্দাজদের পাহাড়। এই সেই পাহাড় রাসুলুল্লাহ এখানে একদল তিরান্দাজ বাহিনী দাঁড় করিয়েছিলেন। তাদের আমির নিযুক্ত করলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ইবনে নুমান আনসারী দাওসী বাদরী (رضي الله عنه)-কে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে লক্ষ করে নির্দেশনা দিলেন, 'শোন! তোমরা আমাদের পিছনের দিকটা রক্ষা করবে। যদি আমরা সবাই নিহতও হই তাহলেও তোমাদের স্থান পরিবর্তন করবে না, যদি দেখো আমরা গনিমত কুড়াচ্ছি, আমাদের সাথে গনিমত কুড়াতে শরিক হবে না! এপাহাড়েরর অপজিটে একটি একটি গিরিপথ ছিল। শত্রুবাহিনী যাতে সেখান দিয়ে আক্রমণ করতে না পারে সেই জন্য তাদেরকে সেখানে পজিশন দিয়েছেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের জন্য এই স্থানটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরের ইতিহাস সবার জানা। সেদিকে আর গেলাম না।

সেই পাহাড়ে উঠবেন। মদীনা আপনার সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠবে। উহুদের বিপর্যয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যে স্থানে নিজের আস্তানা গড়েছিলেন সেখানে পাহাড়ের গায়ে এখনো বড় করে সাদা কালি দিয়ে 'আল্লাহ' শব্দটি লেখা। দেখা মাত্রই একটি ব্যথিত রোদন আপনার ভিতরটায় মুচড় দিয়ে উঠবে। মুয়াল্লিম সেখানে ঘটনা বর্ণনা করবে, আর আপনি কাঁদবেন। কাঁদতে কাঁদতে উহুদকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসবেন। ভিতরে উহুদের জন্য মায়া জন্মাবে। আফসোস হবে, আহ! যদি আরেকটু দেখে নিতে পারতাম। হুনাইন থেকে ফেরার পথে রাসুলুল্লাহ উহুদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে আমরাও তাকে ভালোবাসি!

নবীজির সুরে সুর মিলিয়ে বলি- আমিও উহুদকে ভালোবাসি। ♦

✍ লেখক :
পাঠাগার ও দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফেরাম।

'নাসিহাহ' পত্রিকার
বিজ্ঞাপন রেট

কভারের শেষ পৃষ্ঠা	কভারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	কভারের তৃতীয় পৃষ্ঠা
১৫০০/- টাকা মাত্র	১০০০/- টাকা মাত্র	১০০০/- টাকা মাত্র
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	**ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা**	**ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা**
৫০০/- টাকা মাত্র	৩০০/- টাকা মাত্র	২০০/- টাকা মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ
naseehahmagazine@gmail.com
facebook.com/naseehahmagazine

কবিতা

মুসাফিরের বেশে

✍ আসাদ সরকার

লোভের মোহে সত্য ভুলে পাপে ভরা কর্ম,
পাঠালো যে জগৎ মাঝে বুঝিনি তাঁর ধর্ম।
দিনে রাতে কর্ম খাতে ভুল করেছি শত,
পাপে পাপে জীবন গেলো হৃদ হয়েছে ক্ষত।
মজে থেকে আঁধার পথে ভুলে গেছি প্রভু,
শত হাজার বিপদ থেকে রক্ষা করো তবু।
জীবন গেলো যৌবন গেলো এখন অন্তিম বেলা,
তোমার নামের তাসবি জপায় ছিলো অবহেলা।
বেলা গেলো হেলা করে বুঝি অবশেষে,
খালি হাতে যেতে হবে মুসাফিরের বেশে ।

✍ কবি :
প্রভাষক, নরসিংদী প্রিপারেটরি কলেজ।

♦

এক হও নেক হও

✍ আবদুল্লাহ আল খায়ের

ওলামারা এক হও গড়ে তোলো ঐক্য,
ছাড়ো গালাগাল আর যতো মতানৈক্য।
ইসলামি সুশাসন যদি হয় লক্ষ্য,
অতীতকে ভুলে নাও কুরানের পক্ষ।
তাগুতকে থামানোই যদি হয় মূখ্য,
কাঁধে কাঁধ রেখে চলো দূর হবে দুঃখ।
সময়ের সঙ্কেত দামামার শব্দ,
পাত্তা না দিলে হবে নিদারুণ জব্দ।
ধ্বংসের পদধ্বনি শোনো পেতে কর্ণ
এক হও নেক হও ভোলে দল-বর্ণ।
জনগন সাথে নিয়ে করে যাও চেষ্টা,
কুরানের রঙ দিয়ে সাজাও এ দেশটা।

✍ কবি :
শিক্ষক, তারতিলুল কুরআন মাদরাসা, ভৈরব।

ক্ষমা ও মার্জনা মুমিনের উত্তম আখলাক

- মুফতি মুহাম্মদ আবু সালেহ

ক্ষমা ও মার্জনা মুমিনের উত্তম আখলাক

✍ মুফতি মুহাম্মদ আবু সালেহ

মানব জীবনের শান্তি ও সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য অত্যাধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্ষমা, মার্জনা ও সহনশীলতা। অন্যের দোষ-ত্রুটি বা অনিয়মের কারণে ক্ষুব্ধ হলে কিংবা কষ্ট পেলে উদার মনে, প্রশস্ত হৃদয়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শাস্তি বা প্রতিশোধমূলক কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া এবং উক্ত ব্যক্তির আচরণকে মূর্খচিত মনে করে এড়িয়ে যাওয়ার নাম ক্ষমাও সহনশীলতা। যাকে আরবি ভাষায় বলা হয়- العَفو والصَّفح অর্থ– অন্যায়ের প্রতিশোধ না নেওয়া এবং অন্যায়কে উপেক্ষা করা । যেন দেখেও না দেখা, শুনেও না শোনা, জেনেও না জানা। তথ্যবিদগণ الصفح الجميل এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে কারো অন্যায় অপ্রীতিকর আচরণ এমনভাবে উপেক্ষা করা যে, কষ্ট বা বিরক্তিরও প্রকাশ না ঘটে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ স্বভাব অর্জনের জন্য অনেক আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, আমরা জানি, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা উচিত নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষ তা জুলুমও বটে। জবাবে বলবো, প্রশ্ন আপন অবস্থায় যথার্থ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তো উচিত– এতে সন্দেহ নেই। সুতরাং এখানে অনেক ক্ষেত্রকেই বোঝানো হয়েছে। সর্ব ক্ষেত্রকে নয়। এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হচ্ছে, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যতার কার্যতা নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় তখন প্রযোজ্য ক্ষেত্রের শর্তটি সাধারণভাবে উহ্য থাকে; নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, আমরা জানি, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা উচিত নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষ তা জুলুমও বটে। জবাবে বলবো, প্রশ্ন আপন অবস্থায় যথার্থ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তো উচিত– এতে সন্দেহ নেই। সুতরাং এখানে অনেক ক্ষেত্রকেই বোঝানো হয়েছে। সর্ব ক্ষেত্রকে নয়।

যাই হোক! মানব জীবনে এমন অগণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের চর্চা ও আলোচনা-সমালোচনা অনেক জরুরী। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও সহনশীলতা বিষয়ে কুরআনুল কারীমে নানাভাবে তার বান্দাদের উৎসাহিত করেছেন। মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ক্ষমাপ্রাপ্ত জান্নাতি মানুষের গুণ ও আমল প্রসঙ্গে বলেন,

'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় আবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, ক্রোধ হজম (নিয়ন্ত্রণ) করে, এবং মানুষের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে (তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও জান্নাত)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এমন নেককারদেকে পছন্দ করেন। *(সূরা ইমরান, আয়াত নং- ১৩৪)*

হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'সাদকা করাতে সম্পদের ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদাবৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। *(সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ৭ম, পৃষ্ঠা : ১১৪)*

জুলুম ও বাড়াবাড়ির উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়া ও প্রতিহত করার আইনি বৈধতা রয়েছে। তবে (যদি তা পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শৃঙ্খলার সাথে জড়িত না হয়, তাহলে) সে জুলুম-অত্যাচার সহ্য করে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি কোরআনুল কারীমে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

'যে সবর করে ও ক্ষমাসুন্দর আচরণ করে এটা তার বড় হিম্মতের কাজ।' *(সূরা শুরা, আয়াত নং- ৪৩)*

অর্থাৎ, সবর ও ক্ষমা এমন বিষয় যা অতি কাম্য। আর তার পুরস্কারও অনেক বড়। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উচ্চাভিলাসী মুমিনের জন্য তা অতি আবশ্যক। মুমিনের বৈশিষ্ট্য এমন হওয়া চাই যে, তাঁরা আখেরাতের বিষয়ে উচ্চাভিলাসী হবে। ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা কখনোই উচ্চাভিলাসীতার পথে বাধা হবে না। কারণ মুমিনের সর্বোচ্চ বিশ্বাস ও আস্থা হলো– সুখ-দুখ, হাসি-খুশি, ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হয়; ব্যক্তি শুধু চেষ্টা করে। আর তার ফলাফল আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এক কথায় মুমিনের উচ্চাভিলাস-এর উপাদান নিজস্ব ক্ষমতা নয়, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়াই ভরসা। অপর এক আয়াতে মুমিনের গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

'যখনই (ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে কারো অন্যায়ের প্রতি) ক্রোধ দেখা দেয়, তখনই তারা ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে। *(সূরা শুরা, আয়াত নং-৩৭)*

কুরআনুল কারিমে ক্ষমা বিষয়ক এক বিস্ময়কর ঘটনা :

সূরা নূরের শুরুর কয়েকটি আয়াতের প্রেক্ষাপট উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা-এর জীবনের এক মর্মান্তিক ও মহাসৌভাগ্যর ঘটনা। যা সিরাতগ্রন্থে ইফকের (অপবাদ) ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাটি একদিকে ছিল মর্মান্তিক। কারণ, আম্মাজানের মতো পূতপবিত্র সতী নারীর প্রতি তোহমত (অপবাদ) আরোপ। অপরদিকে ছিল মহাসৌভাগ্যের। কারণ, উক্ত অপরাধী মুনাফিকদের জবাবে ও আম্মাজানের পূতপবিত্রতার ঘোষণায় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেছেন।

আম্মাজান বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ্ পাক ওহীর মাধ্যমে রাসূল (ﷺ)-কে সঠিকতা জানিয়ে দিবেন। তবে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে অবগত করবেন এটা ছিল ধারণা অতীত!' (সুবহানাল্লাহ)। অপবাদকারীদের মধ্যে একজন ছিল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকটতম আত্মীয় 'মিফতাহ' যাকে নিয়মিত আবু বকর (رضي الله عنه) আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কিন্তু সে মোনাফেকদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে অপবাদ আরোপকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। যা হোক! পরে যখন আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে সত্যতা সকলের সামনে উন্মোচিত করলেন, তখন তিনি লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করেন। কিন্তু বিষয়টি হযরত আবু বকর (رضي الله عنه)-এর কাছে ছিলো অসহনীয় ও বড়ই দুঃখের। তাই তিনি পরবর্তীতে তার প্রতি করা আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেন এবং ওয়াদা করেন যে আর কখনো তাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন না। এ প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন–

'তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তাঁরা যেন কসম না খায় যে, তাঁরা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাঁদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।' *(সুরা নুর : আয়াত নং -২২)*

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে ক্ষমা করে দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার আগে মানুষের প্রতি উদার হতে, দয়া দেখাতে নসিহত পেশ করেছেন। সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন যে, তারা যেন তাদের অধীনস্ত, গরিব কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত তাদের কোনো কিছু না দেয়ার ব্যাপারে কসম না করে। এ আয়াতটি শুনে হযরত আবু বকর رضي الله عنه অনেক বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন। নিজের মর্যাদা নিয়ে গেছেন অনেক উচ্চতায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠেছেন, 'হ্যাঁ', আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই চাই আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন।' তার তিনি মিসতাহ'র প্রতি আর্থিক সাহায্য পুনরায় বহাল করে নেন এবং বলেন- 'এ সাহায্য কোনোদিন বন্ধ হবে না।' (বুখারি শরীফ, তাফসিরে কুরতুবি) উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্বমানবতার সবাইকে নিকটাত্মীয়, গরিব-অসহায়দের প্রতি উদারতা কিংবা ক্ষমা করা সফলতার জন্য নিজেদের গুণ বানিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যকীয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার তাওফিক দান করুন। আল্লাহর ক্ষমা লাভে নিজেদের তৈরি করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক :
সহকারী মুফতি, মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা।

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে
আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৩)

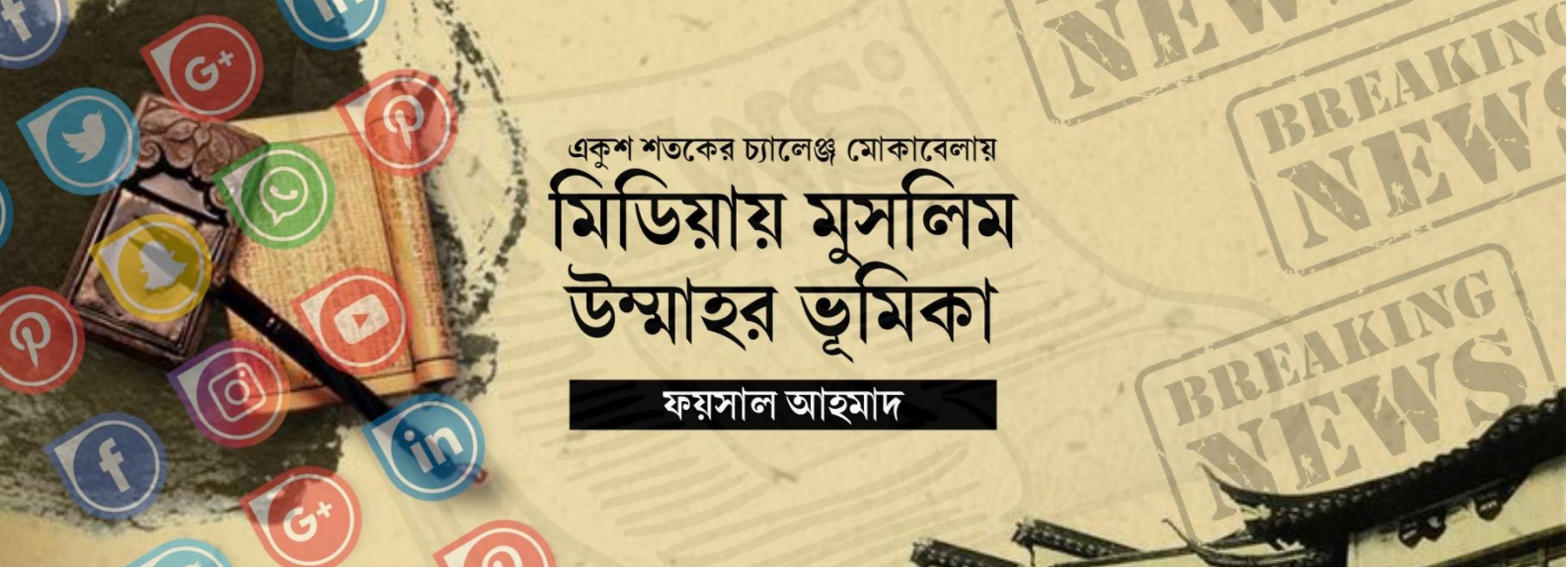

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়

মিডিয়ায় মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা

ফয়সাল আহমাদ

বিশ্ব সংবাদের মোট ৮০ পার্সেন্ট আসে উল্লেখিত এ চারটি পশ্চিমা সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে। যেখানে তারা নিজেদের দেশের অন্যায় কর্মকান্ডের উপর মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না। তাঁর মতে, পশ্চিমা মিডিয়াগুলো দরিদ্র দেশের খারাপ সংবাদগুলো; যথা– মারামারি, হানাহানি, সংকট, বিদ্রোহ, লড়াই ইত্যাদির সংবাদগুলোই বেশি প্রাধান্য দেয়। এভাবে তারা দরিদ্র দেশ ও সমাজগুলোকে বিশ্বের সামনে হাস্যকর হিসেবে উপস্থাপন করে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়

মিডিয়ায় মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা

মাওলানা ফয়সাল আহমাদ

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শিলজ ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ স্টেফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ দানকালে মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, মিডিয়ার বিপ্লব আমাদের পৃথিবীকে এভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারে, যেভাবে গত শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব পৃথিবীর অবকাঠামোকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। শিল্পবিপ্লব যেভাবে পুরো বিশ্বের সামনে পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থানকে উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে, একুশ শতকের সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি মিডিয়া পুরো দুনিয়াকে তার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পবিপ্লব ইউরোপের এমনি এক মহা অর্জন– যার মাধ্যমে তারা পুরো পৃথিবীতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়। তেমনিভাবে বর্তমানের মিডিয়া পশ্চিমাদেরই হাতে গড়া এমন এক শক্তি যার সাহায্যে তারা অতি সহজেই পূর্ব দুনিয়াকে মানসিকভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখা হয়। যথা- শিল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশ। মিডিয়ার বিবেচনায় যদিও এ ধরনের কোন তারতম্য ও ভাগ স্পষ্ট করার জন্য পরিভাষা চালু হয়নি, তবুও বাস্তবতার দর্পণে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত। উন্নত দেশ ও অঞ্চল হিসেবে ইউরোপ ও আমেরিকা এক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যেগুলো মিডিয়া জগতে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল যা সবারই জানা আছে।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বের শীর্ষ চারটি সংবাদ সংস্থা যথা- এপি, এএফপি, ইউপিআই ও রয়টার্স; সবগুলোই পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এই সংবাদ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সংবাদ আহরণ ও বিতরণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক এসব সংবাদ সংস্থ াগুলো তাদের বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শুধু নিজেদেরই জনমত নয়, বরং পুরো বিশ্বের সম্প্রদায়ের মতামতের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। এসব তথ্য-সাম্রাজ্যবাদীরা এতটাই শক্তিশালী, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের মোকাবেলা করা বড়ই দুষ্কর। উন্নয়নশীল দেশগুলোর যাবতীয় প্রচারতথ্য দ্বারা অন্য দেশগুলো এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, তারা নিজ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পর্যালোচনা পর্যন্ত পশ্চিমা সংস্থাগুলো থেকে ধার নিয়ে বা তাদের রেফারেন্স দিয়ে বিতরণ করে থাকে। পূর্বের কোন দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি বা ক্ষুণ্ন করার জন্য উন্নত রাষ্ট্রসমূহের সংবাদ সংস্থাগুলোর ভূমিকাই যথেষ্ট।

তিউনিসিয়ার বিখ্যাত মুসলিম স্কলার মুস্তফা আল-মাসউদ এর মতে, বিশ্ব সংবাদের মোট ৮০ পার্সেন্ট আসে উল্লেখিত এ চারটি পশ্চিমা সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে। যেখানে তারা নিজেদের দেশের অন্যায় কর্মকান্ডের উপর মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না। তাঁর মতে, পশ্চিমা মিডিয়াগুলো দরিদ্র দেশের খারাপ সংবাদগুলো; যথা– মারামারি, হানাহানি, সংকট, বিদ্রোহ, লড়াই ইত্যাদির সংবাদগুলোই বেশি প্রাধান্য দেয়। এভাবে তারা দরিদ্র দেশ ও সমাজগুলোকে বিশ্বের সামনে হাস্যকর হিসেবে উপস্থাপন করে।

ইউনেস্কোর এক প্রাক্তন কর্মকর্তার মতে, উন্নত দেশগুলো তাদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সংবাদ সংস্থাগুলোকে এভাবে ব্যবহার করে যে, নিজেদের কুকর্মের কোন খবরই প্রকাশ করে না। শুধুই পূর্ব দেশগুলোর সংকট, সমস্যা, হানাহানি, বিশৃঙ্খলাই প্রকাশ করে এবং উন্নয়নের পথে দরিদ্র দেশগুলোর প্রয়াসের সংবাদগুলো এড়িয়ে যায়। তারা নিজেদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদকে বিশ্বের সামনে বৃহৎ আকারে তুলে ধরে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই মিডিয়া মুসলিম দেশগুলোর মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এভাবে তারা বিশ্বের দরবারে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে।

এ আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে, মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমাদের মিডিয়া-সাম্রাজ্যের কাছে পদানত। হুমকির সম্মুখীন মুসলিম দেশসংশ্লিষ্ট স্বার্থসমূহ। মিডিয়ার জগতে মুসলিম বিশ্বের তেমন কোন অস্তিত্ব নেই, যা বিশ্বের দরবারে আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা/স্বনির্ভরতা তুলে ধরার জন্য অপরিহার্য ছিল। আর একথাও প্রতীয়মান যে, মুসলিম রাষ্ট্রে মৌলিকভাবে দুইটি ত্রুটি বিদ্যমান-

১. মুসলিম দেশে নিম্নশিক্ষার হার বেশি।
২. মুসলিম দেশ প্রযুক্তির ধারায় সবচে পিছিয়ে।

আমাদের প্রয়োজন নিজস্ব এই দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করে মুসলিম জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা, এবং পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক মিডিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করা। ■

লেখক :
নবীন লেখক, আলেম ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

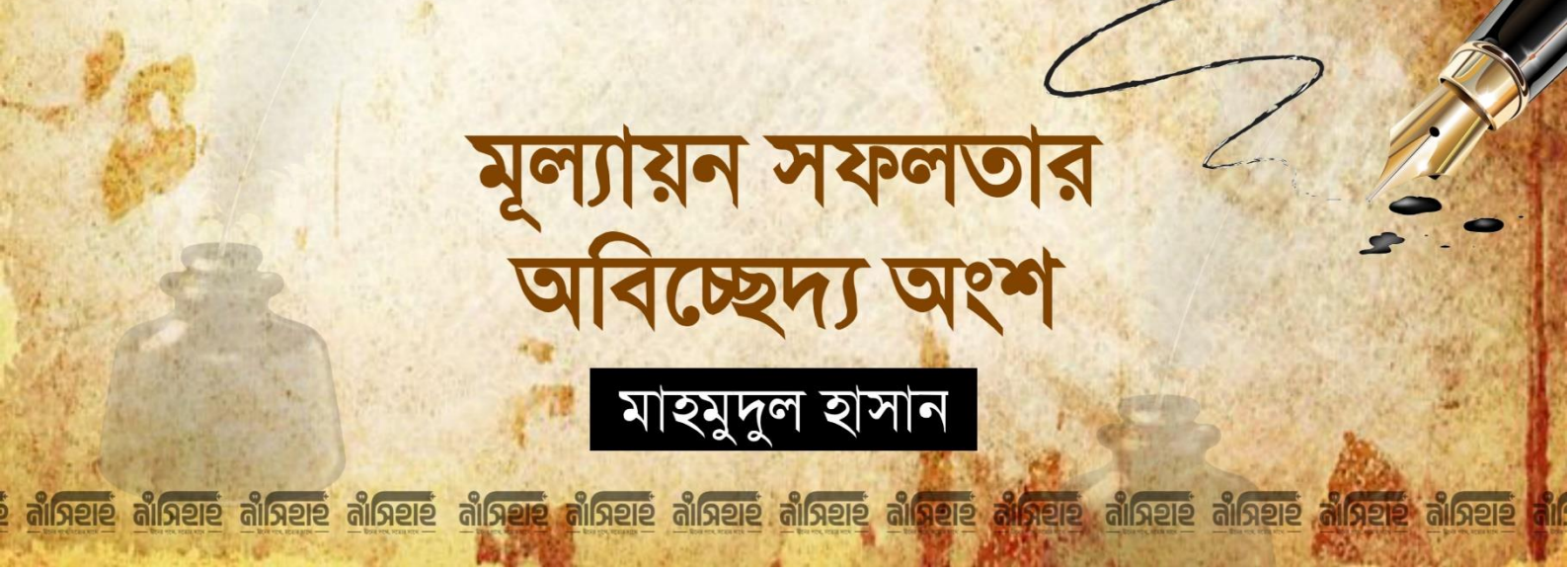

মূল্যায়ন সফলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

আমরা বিভিন্ন সময় নানা মাধ্যমে বড়দের মূল্যবান নাসিহাহ্-সংবলিত বাণী থেকে বা নিজেদের অধ্যয়ন থেকে মানব জীবনের ইহকালিন ও পরকালীন উভয় জগতের সফলতার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অসংখ্য দিকনির্দেশনা ও উপদেশ পাই। আমরা যদি খুব গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি, তাহলে এই বিষয়টি অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে উপলব্ধি করতে পারবো যে, আমরা যা শিখেছি, বুঝেছি এবং অর্জন করেছি তার মূলে অন্যতম শক্তি ছিলো 'মূল্যায়ন'; সেটা যেকোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন। এখনো আমরা যে সকল বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করছি, মূল্যায়ন করছি এবং অন্তরে তা স্বযত্নে ধারণ করছি, চেতনায় লালন করছি– তা কেবল এই 'মূল্যায়ন' জাগ্রত থাকার কারণে। অন্যথায় কেন একই প্রতিষ্ঠানের একই শিক্ষব্যবস্থার দীর্ঘ ছায়ায় বেড়ে উঠার পরও একজন শর'য়ী বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে এবং সেটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আর অন্যজন শর'য়ী বিষয়গুলোকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করেছে। এমনিভাবে কেউ কোরআন-সুন্নাহের এই গৌরবময় 'ইলমে দ্বীন' অর্জনের পর তার সৌরভ থেকে দূরে সরে কোনো পেশায় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যেন, ইলমের সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিলো না, ইলম থেকে কখনোই সে উপকৃত হয়নি! এতগুলো বছর যে সে, ইলমের জন্য কাটিয়ে ছিল তা ছিলো একটি ছলনা মাত্র এবং উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক সময় অতিবাহিত করার নামান্তর! আবার কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইলমের জন্য যেন জীবন বিলীন করে দিবে। তার সামনে এই জীবনের আরাম-আয়েশের কোনো মূল্যই নেই। সুবহানাল্লাহ!

একই প্রতিষ্ঠানের একই শিক্ষব্যবস্থার দীর্ঘ ছায়ায় বেড়ে উঠার পরও একজন শর'য়ী বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে এবং সেটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আর অন্যজন শর'য়ী বিষয়গুলোকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করেছে। এমনিভাবে কেউ কোরআন-সুন্নাহের এই গৌরবময় 'ইলমে দ্বীন' অর্জনের পর তার সৌরভ থেকে দূরে সরে কোনো পেশায় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যেন, ইলমের সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিলো না, ইলম থেকে কখনোই সে উপকৃত হয়নি!

এ ধরণের হাজারো দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে বিদ্যমান। এই 'মূল্যায়নের' অভাবেই আমরা বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রয়োজনিয়তা-আবশ্যকিয়তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ যথাযথ উপলব্ধির পরও তা অর্জনে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছি। আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় উসতাযে মুহতারাম-এর জবান থেকে একাধিক বার শুনেছি– যে কোনো ভালো বিষয়– চাই তার গুরুত্ব যতই বেশি হোক না কেন কিংবা যতই কম হোকনা কেন; যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টিকে যথাযথ মূল্যায়ন না করা হয় এবং পূর্ণ গুরুত্ব না দেয়া হয়, ততক্ষণ কোনো ভালো ফলাফলের আশা করা যায় না।

এ কারণে দেখা যায় যে, ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানের তুলনায় একটি ছোট বিষয় বা আমল গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করার কারণে তা হতে যেই ফায়দা ও ফলাফল লাভ করা যায়, অবস্থানের বিচারে তার চাইতেও বড় কোনো বিষয়ে গুরুত্বের কমতির কারণে, মূল্যায়নের অভাবে তৎসম ফলাফল লাভে ব্যর্থ হতে হয়। এজন্য যে কোনো ভালো বিষয়কে ছোট মনে না করা, তুচ্ছ জ্ঞান করে গুরুত্বহীন না ভাবা, বরং সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। এই শিক্ষাই আমরা ইসলাম থেকে পাই। হাদিসে এসছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: « قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ .»

অর্থ : হযরত আবু যর ﵁ বলেন, আমাকে নবীজি ﷺ বলেছেন, 'অবশ্যই তোমরা কোনো ভালো কাজকে ছোট মনে কর না। যদিও সেই কাজটি হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা বা কথা বলার মত সামান্য কাজ। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬২৬)

অন্য আরেকটি হাদিসে প্রিয়নবী ﷺ বলেন,

« عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ ».

অর্থ : আমার সামনে আমার উম্মতের নেক-বদ সকল আমলনামা পেশ করা হয়। আমি তাদের নেক আমলের মধ্যে দেখতে পেলাম রাস্তা থেকে কষ্টদায়াক বস্তু সরানোর মত আমলকেও। আর বদ আমলের মধ্যে দেখতে পেলাম এমন শ্লেষ্মা যা মসজিদে ফেলে রাখা হয়েছে অথচ তা দাফন করা হয়নি। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৫৫৩)

এমনি প্রস্রাবের ছিটা থেকে না বাঁচার কারণে কবরে আযাব হওয়ার হাদিসটিও সকলের জানা আছে। তারা সামান্য বিষয়ে অবহেলার কারণে কবরে আযাবের সম্মুখিন হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ».

অর্থ : তোমরা পেশাব থেকে বেচে থাক; কারণ কবরের বেশির ভাগ আজাব পেশাবের কারণে হয়ে থাকে। (দারাকুতনী, হাদীস নং : ৪৬৪)

এসকল হাদীস থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, দ্বীনের কোনো বিষয়কেই ছোট মনে করে তা থেকে গুরুত্বহীন হওয়া যাবে না। আর কোনো গুনাহ ও অপরাধকে ছোট ও ক্ষীণ মনে করে তা থেকে গাফেল এবং অসতর্ক হওয়া যাবেনা। মনে করতে হবে আমার নাকামিয়াবী আর ব্যর্থতার জন্য হয়তো এটাই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীনের সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ গুরত্ববোধ ও মূল্যায়ন দান করুন। আমিন।

লেখক :
শিক্ষক, মদিনাতুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা, লাকসাম, কুমিল্লা।

মহরে নবুওয়াত : এক টুকরো গোশতের ইতিবৃত্ত

সায়েব ইবনু ইয়াযিদ। ভীষণ অসুস্থ। মাঝেমধ্যে ব্যথায় ককিয়ে উঠছেন যেনো। কী করবেন, কী করা উচিত তাঁর; কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। দিকশূন্য, দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। কার কাছে যাবেন, কোথায় গেলে তার ব্যথার উপশম মিলবে– এমন চিন্তায় যখন তিনি উৎকণ্ঠিত, তখন তাঁর খালা এলেন। তিনি তাকে নিয়ে চললেন নবীজি ﷺ-এর কাছে। নবীজি ﷺ ছিলেন সেকালে সবার আশ্রম। দুখি, ইয়াতিম-অনাথ, বিপদগ্রস্ত সবাই তাঁর কাছে আসত। খোঁজে ফিরত একটুখানি সুখের পরশ। চৈত্রের দগদগে দুপুরের খরা রোদে পথিক যেমন খোঁজে একটুখানি ছায়া। একগ্লাস শীতল পানি। একটুখানি জিরোবার মোক্ষম আশ্রম। সেকালে সাহাবিরা খোঁজতেন একটুখানি নবীজির আশ্রয়ের সুযোগ। নবীজিও উদারমনে সবাইকে আগলে নিতেন। সহযোগিতা করতেন। পাশে দাঁড়াতেন।

নবীজির নিকট পৌঁছে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ! আমার বোনের ছেলেটা ভীষণ অসুস্থ। ব্যথায় মুষড়ে পড়ছে। আপনার পবিত্র পরশ চাই। নবীজি ﷺ হাত বুলিয়ে দিলেন। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির কারণে জমিন যেমন চৌচির হয়ে যায়, সবুজে তৃণলতাগুলো শুকিয়ে শুকনো খড়বিচালির মতো পাংশুটে হয়ে পড়ে; আবার যখন জমিনে বৃষ্টি নামে তখন প্রকৃতি ফিরে পায় সজীবতা, আগের মতো লকলক করে বেড়ে ওঠে তৃণলতাগুলো। ঠিক সেরকম যেনো সায়েব এতদিন পড়ে ছিল অনাবৃষ্টিতে। নবীজির ﷺ হাতের পরশে যেন তাঁর উপর রহমের বারিষ নেমে এসেছে আজ। এমন আদরমাখা বরকতি পরশ কোনদিন সে আর অনুভব করেনি। মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল সব ব্যথা-বেদনা। ফিরে পেলেন তিনি চঞ্চলতা, চপলতা। অতঃপর রাসুল ﷺ সায়েবের জন্য কল্যাণের দোয়া করে দিলেন।

তারপর নবীজি ﷺ ওজু করার জন্য এগোলেন। পানিভরতি একটা ছোট্ট ঘটি হাতে নিলেন। ওজু করার পর অল্প পানি অবশিষ্টও রয়ে গেল সেই ঘটিটিতে। সায়েব মোক্ষম সুযোগ মনে করে বরকতের আশায় গলগল করে গিলে ফেললেন অবশিষ্ট পানি। তারপর চুপিচুপি নবীজির ﷺ পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফলে, সুযোগে দেখে ফেললেন নবীজির দুই কাঁধের মধ্যখানে অবস্থিত **মহরে নবুওয়াত**। জ্বলজ্বলে লালচে একটুকরো উত্থিত গোশত। কিছুটা কবুতরের ডিমের মতো বা আপেলর মতো গোলগাল। তাতে ফকফক করছিলো নূরের জ্যোতি, হেদায়েতের দ্যুতি।

মহরে নবুওয়াত নবীজির বিশেষ এক রকম মোজেজা। নবুওয়াতের নিদর্শন। অন্য কোনো নবীর নবুওয়াতের এমন কোনো চিহ্ন ছিল না। একমাত্র আমাদের শেষ নবীরই ছিল এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মহরে নবুওয়ত। ●

(শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬)

নুরুল ইসলাম তানঈম
শিক্ষার্থী : জামিয়াতুন নূর আল কাসেমিয়া (নিউ বারিধারা) উত্তরা, ঢাকা।

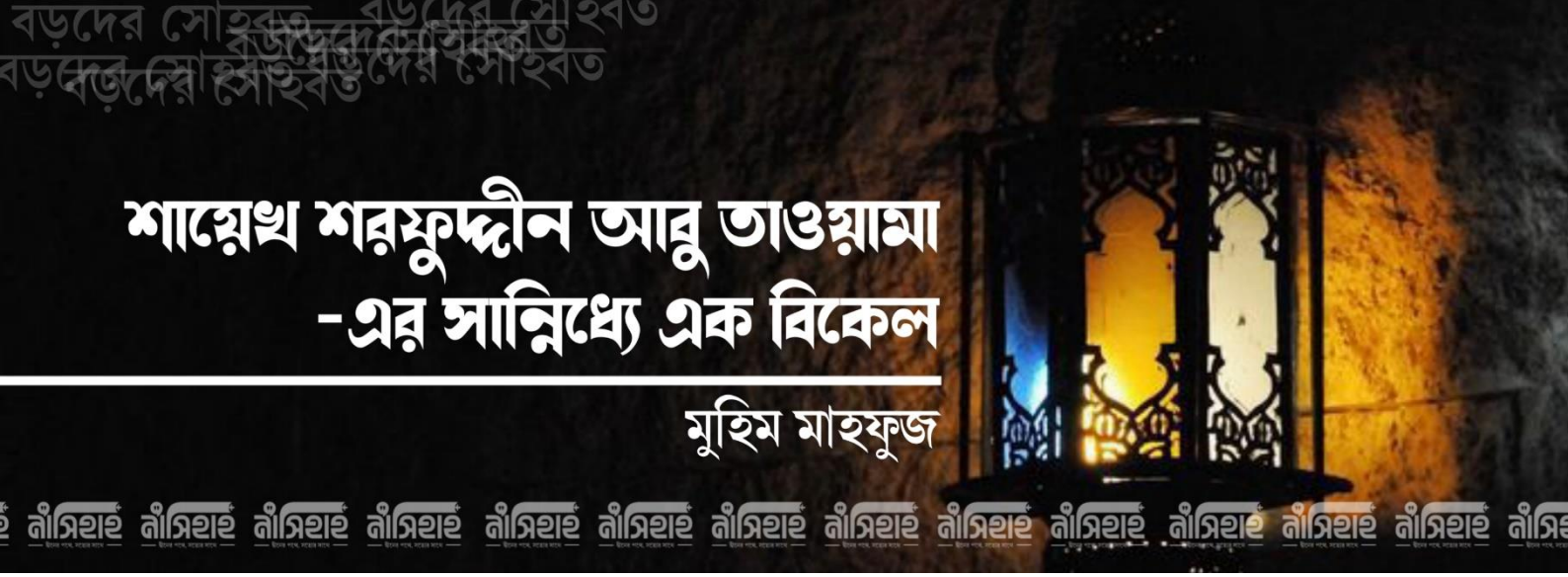

শায়েখ শরফুদ্দীন

আবু তাওয়ামার সান্নিধ্যে এক বিকেল

মাওলানা মুহিম মাহফুজ

দুপুরে খাবার সময় মাওলানা আব্দুর রহিম ভাই বললেন, আজ সকালে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি। তার কথা আমাদের কৌতুহলী করে তুললো। চেহারায় ঔৎসুক্য নিয়ে আমরা তার দিকে তাকালাম। বললেন, ফজরের পর একটু ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, শায়েখ আবু তাওয়ামার কবর জিয়ারত করতে গিয়েছি। এ স্বপ্নবর্ণনা আমাদের অবাক করলো বটে। তবে অবাক হবার চেয়ে আমরা বিষণ্ন হলাম বেশি। প্রায় এক মাস হতে চললো সোনারগাঁও অবস্থান করছি। কিন্তু উপমহাদেশের প্রথম হাদিসের শিক্ষক শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার কবর এখনো জিয়ারত করা হলো না। অথচ তিনি ইসলাম প্রচারে জন্মভূমি উজবেকিস্তানের বোখারা থেকে দিল্লি হয়ে প্রাচীন বাংলার রাজধানী এই সোনারগাঁ এসে পৌঁছেছেন। তাঁর হাতে উপমহাদেশের প্রথম হাদিসের দরসগাহ বা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বর্তমান মোগড়াপাড়া চৌরাস্তা থেকে চার কিলোমিটার পশ্চিমে দরগাহপাড়া মহল্লায় তার ভগ্নাবশেষ এখনো কালের সাক্ষী হয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে।

শায়েখ আবু তাওয়ামা শুধু হাদিসের শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন ভেষজশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল ও রসায়নশাস্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞ। তার প্রতিষ্ঠানে হাদিসের পাশপাশি শিক্ষা দেওয়া হতো ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র, তাসাউফ বা মুসলিম অধিবিদ্যা, মানতেক বা তর্কশাস্ত্র, তারিখ বা ইতিহাসসহ ইসলামের প্রায় সামগ্রিক বিষয়াবলি। একই সঙ্গে পাঠদান করা হতো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্র–

পাঠ শুরু হলে তিনি আরও বিস্ময়কর এক স্বপ্ন দেখেন- 'মাদরাসার মাঠে সব শিক্ষক উপস্থিত এবং অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এসেছেন। মাঠের এক পাশে এক ব্যক্তিকে দেখে তিনি বললেন, এই ব্যক্তি কি হজরত উসমান গনি ﷺ? তাঁকে বলা হলো, হ্যাঁ, তিনি উসমান গনি ﷺ।" মাওলানা নজরুল ইসলামের বক্তব্যে জানা যায়, এই স্বপ্ন দেখার পর তার পিতা পরিচালিত মাদরাসার সার্বিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৌবিদ্যা, ভেষজ, গণিত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি। উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে প্রায় আটশ বছর পর প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন আরেকটি ইলমের দরসগাহ, আরেকটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়– বাগেমুসা ইসলামিক সেন্টার। ২৫ মে ২০২২ ঈসায়ী সনের রোজ বুধবার ঐতিহাসিক পানাম নগর সংলগ্ন বাগমুছা মহল্লায় সূচনা হয় এর আনুষ্ঠানিক দরস। শায়েখ আবু তাওয়ামার দরসগাহের মতো যুগের প্রয়োজন পূরণে এবং সমাজ-রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গঠনে এই প্রতিষ্ঠানও একদিন ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়ে নেবে– এ আমাদের তুমুল তামান্না। আমাদের বুক ভরা এই স্বপ্নের আগুন। আমাদের চোখে এই স্বপ্নের সাগর।

উলুমুল হাদিসের দায়িত্বশীল মাওলানা আব্দুর রহিম ভাইয়ের স্বপ্ন আমার মস্তিস্কে এসব চিন্তার ডালপালা বিস্তার করে দিলো। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, আব্দুর রহিম ভাইয়ের স্বপ্নসংযোগ একেবারে কালতালীয় নয় মোটেই। আটশ বছর আগের হাদিসে নববীর জ্যোতি আটশ বছর পরের হাদিসের দরসগাহগুলোতে এখনো বিচ্ছুরিত হচ্ছে! হাদিসের নুর আর নুরের তাজাল্লি এখনো আলোকিত করে চলেছে অগণিত ব্যাকুল হৃদয়। ঘুম ভেঙে জাগিয়ে তুলছে অসংখ্য সুপ্ত প্রাণ। উপ-পরিচালক মুফতি আতিক সাহেব প্রস্তাব করলেন, আজ বিকেলেই শায়েখের কবর জিয়ারাতে যাবো ইনশা আল্লাহ। আমরা সোৎসাহে সম্মতি প্রকাশ করলাম। শিক্ষাসচিব মাওলানা আলাউদ্দীন ভাই স্থানীয় হবার কল্যাণে রাহবারির দায়িত্ব নিলেন। আসরের খানিক আগে আমরা রওনা করলাম শায়েখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা রহিমাহুল্লার কবর জিয়ারতে।

০২

অটো রিকশায় করে আমরা চললাম মোগড়াপাড়া চৌরাস্তার উদ্দেশ্যে। উপ-পরিচালক মুফতি আতিকুর রহমান, শিক্ষাসচিব মাওলানা আলাউদ্দিন রফিক, হাদিসের শিক্ষক মাওলানা আবদুর রহিম এবং এই নগণ্য রচনাকার। মাওলানা আলাউদ্দিন ভাই শায়েখ আবু তাওয়ামার নামে 'শায়েখ আবু তাওয়ামা ইসলামি একোডেমি' গড়ে তুলেছেন। দীর্ঘ আট বছর এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। গাড়িতে বসে আলোচনা উঠলো শায়েখ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। কেন তখন সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তার নির্দিষ্ট কারণ এখন আর জানা যায় না। তবে প্রায় ৬৫০ বছর পর স্থানীয় এক বর্ষিয়ান আলেমের স্বপ্ননির্দেশের মাধ্যমে পুনরায় চালু হয় হাদিসের দরস। মুফতি আতিক ভাই জানালেন, তার নাম মাওলানা হাতেম আলী দা. বা.। তিনি সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর সর্বশেষ খলিফা। একটু অনুসন্ধানে পাওয়া গেলো মাওলানা হাতেম আলীর স্বপ্ন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ। মারকাযুদ দিরাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ ঢাকার শিক্ষক মাওলানা বেলায়েত হুসাইনের একটি রচনায় পাওয়া যায়, দীর্ঘ ৬৫০ বছর বন্ধ থাকে এটি। অবশেষে সোনারগাঁয়ে ফের হাদিসের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। পাশেই অবস্থিত জামিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়ায় ২০০৬ সালে হাদিসের পাঠদান শুরু করেন স্থানীয় বর্ষীয়ান আলেম মাওলানা হাতেম আলী। মাওলানা হাতেম আলীর পুত্র মাওলানা নজরুল ইসলামের জবানিতে লেখক উল্লেখ করেন, "সোনারগাঁয়ে পুনরায় হাদিসের পাঠদান শুরু করতে আমার পিতা একাধিকবার স্বপ্নে ইঙ্গিত পান। পাঠ শুরু হলে তিনি আরও বিস্ময়কর এক

স্বপ্ন দেখেন- ‘মাদরাসার মাঠে সব শিক্ষক উপস্থিত এবং অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এসেছেন। মাঠের এক পাশে এক ব্যক্তিকে দেখে তিনি বললেন, এই ব্যক্তি কি হজরত উসমান গনি ﷺ? তাঁকে বলা হলো, হ্যাঁ, তিনি উসমান গনি ﷺ।” মাওলানা নজরুল ইসলামের বক্তব্যে জানা যায়, এই স্বপ্ন দেখার পর তার পিতা পরিচালিত মাদরাসার সার্বিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়।

এ প্রসঙ্গে নতুন তথ্যের অবতারণা করলেন মাওলানা আলাউদ্দিন ভাই। জানালেন, উপমহাদেশের বিখ্যাত দায়ী, আন্তর্জাতিক মুসলিম স্কলার সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. নদওয়াতুল উলামা লখনৌ, ভারত থেকে এখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেন তার শাগরেদ মাওলানা উবাইদুল কাদের নদভীকে। শায়েখের নির্দেশে তিনি এখানে “মাদরাসাতুল শরফ আল ইসলামিয়া” নামে একটি মাদরাসা গড়ে তোলেন। প্রচলিত মাদরাসার পাশাপাশি মাওলানা নদভী তার শায়েখের নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি ইসলামিক স্কুল- “সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ইসলামিক স্কুল”।

আলোচনা-পর্যালোচনায় ইতিহাসের অজানা অনেক অধ্যায় আমাদের সামনে উন্মোচিত হলো। এর মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম মোগড়া পাড়া চৌরাস্তায়। গাড়ি থেকে নেমে ফুট ওভারব্রিজ পায়ে হেঁটে পার হলাম চট্টগ্রাম মহাসড়ক । অপর পাশ থেকে আবার অটো রিকশায় চড়লাম। এবার গন্তব্য সরাসরি দরগাহ বাড়ি। শায়েখ আবু তাওয়ামার কবর ও মাদরাসার ভগ্নাবশেষ যেখানে। (চলবে...)

mo.mahfuz@gmail.com

কবিতা

আমি হবো

✍ সাদমান হাফিজ শুভ

সবুজ ঢেউয়ে দেশ সাজাব
পথচারী পাবে ছায়া,
পক্ষীকুলে অন্ন পাবে
পাব প্রভুর অসীম মায়া।
তাই তো মনে স্বপ্নবাজি-
আমি হব বৃক্ষরাজি ॥
উড়ে উড়ে যাব আমি
দূর হতে দূর-দূরান্তরে,
দেখব আমি সবুজ বরন
জনম জনম নয়ন ভরে।
তাই তো মনে স্বপ্ন আঁকি-
আমি হব উড়াল পাখি ॥
রং-বেরঙে ভরবে উঠোন
হৃষ্ট হবে মালীপাড়া,
রাঙবে তাদের কোমল হৃদয়
জাগবে প্রাণে খুশির সাড়া।
তাই তো মনে স্বপ্ন ঢালা-
আমি হব পুষ্পমালা ॥
যাব আমি ফুলে ফুলে
দেখব অতি নিকট থেকে,
আনব আমি অমৃত জল
ফুলে ফুলে চেখে চেখে।
তাই তো মনে সদাই বলি-
আমি হব ফুলের অলি ॥
তপ্ত দিনে ধরার মাঝে
জল ছড়াব রাশি রাশি,
পাতায় পাতায় খুশির জোয়ার
ফুটবে মানবমুখে হাসি।
তাই তো মনে স্বপ্নেরই বাস-
আমি হব মেঘলা আকাশ।

✍ **কবি :**
ঠিকানা : গোসাই জোয়াইর, টাঙ্গাইল।

এক মহিরুহ মাওলানা :

জীবন, কর্ম ও ইতিহাস

ফয়সাল আদিব

এক মহিরুহ মাওলানা

জীবন, কর্ম ও ইতিহাস

ফয়সাল আদিব

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে চিঠি হাতে এক মাওলানা উপস্থিত। তাঁকে দেখেই বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুর এতদিন পর আমার কথা মনে হল? এখানে (রাষ্ট্রপতির আসনে) বসার পর যেন সবাই দূরে সরে গেছে। 'মাওলানা বললেন, 'তথ্যমন্ত্রণালয়ের এক নোটিশে আমার পত্রিকা বাতিল করে দেয়া হয়েছে, তাই এসেছি।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুই ত রাজাকার ছিলি না। তুর পত্রিকা কেন বন্ধ করল? অতঃপর পিএসকে বললেন, 'তথ্যসচিবকে কল লাগাও।' মাওলানা হাতে থাকা চিঠিটা বঙ্গবন্ধুর দিকে এগিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধু চিঠিটা পড়তে গিয়ে কেঁদে দিলেন। চিঠিটা টুঙ্গিপাড়া থেকে এক পত্রিকা সম্পাদক বরাবরে লিখা হয়েছে, হাতের লেখাও তার অতি পরিচিত। চিঠিটা বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফুর রহমানের লেখা। চিঠিতে লেখা ছিল,

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেব,

আমার সালাম নিবেন।আশা করি ভাল আছেন। পরকথা হল,আমি "মাসিক মদিনা" পত্রিকার একজন নিয়মিত গ্রাহক।গত দু'মাস যাবৎ পত্রিকাটি আমার নামে আর আসছে না।তিন মাসের বকেয়া বাকি ছিল।হয়ত এই কারণেই আপনারা পত্রিকা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।আমি শেখ মুজিবকে চিঠি লিখে বলে দেব সে যেন আপনাদের টাকা পরিশোধ করে দেয়।আমি বৃদ্ধ মানুষ,প্রিয় পত্রিকা ছাড়া আমার সময় কাটানো বেশ কষ্টকর।আশা রাখি, আগামী মাস থেকে পত্রিকাটি পড়তে পারব।আমার জন্য দু'আ করবেন আমিও আপনাদের জন্য দু'আ করি।

ইতি,
শেখ লুৎফুর রহমান
টুঙ্গিপাড়া,ফরিদপুর।

পূর্বযুগে সালাফরাও ছিলেন এমনই। তাঁরাও রাজা-বাদশাহের দরবারে ধর্ণা দিতেন না, রাজা-বাদশাহের তোষামোদে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন না। কিন্তু যখন বঙ্গবন্ধুর বাবার চিঠি হাতে পৌঁছাল তখন তিনি নিজেকে দমাতে পারলেন না। বৃদ্ধ মানুষটির কষ্ট তাঁকেও আঘাত করেছিল। তাই তাঁকে ও তাঁর পত্রিকাকে রাজকারের তোকমা দিয়ে যে রাষ্ট্র নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল বাধ্য হয়ে সে রাষ্ট্রের কাছে ছুঁটে গিয়েছিলেন; পত্রিকা আবারও চালু করার অনুরোধ জানাতে নয়, বরং চিঠি পাঠানো বৃদ্ধ মানুষটির মনোবেদনা রাষ্ট্রকে অনুভব করাতে।

চিঠি পড়া শেষ করে টপটপ অশ্রুচোখে মাওলানাকে জড়িয়ে ধরে বঙ্গবন্ধু বলতে লাগলেন, 'তুই আমার কাছে আরও আগে আসলি না কেন? হারামজাদাকে (তথ্যসচিবকে) ত কোন ইসলামি পত্রিকা বন্ধ করার নির্দেশ আমি দিইনি। আজ আমার বাবা আর বেঁচে নেই। গত কয়েকদিন আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। *(আহমাদ সাব্বির লিখিত **'কিংবদন্তির কথা বলছি'** বই থেকে সংগৃহিত)*

পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান রহিমাহুল্লাহ। স্বাধীনতাকালীন সময়ে যে পত্রিকা বাংলার ঘরে ঘরে জায়গা করে নিয়েছিল, তখনকার সময়ে দশলাখের অধিক পাঠকের আস্থা কুড়িয়ে নিয়েছিল সে পত্রিকার নাম 'মাসিক মদিনা'। সম্পাদক যখন এই নামে পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে কটাক্ষ করে বলেছিল, 'মক্কা-মদিনা' এসব নাম মার্কেটে এখন আর খায় না। কিন্তু মদিনার প্রতি ভালবাসা থেকে তিঁনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে নেমে পড়েন জীবনসংগ্রামে। এরপর আল্লাহর সাহায্যে এই পত্রিকা যে পথ পাড়ি দেয় তা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। উনিশ শতকে জন্ম নেয়া এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে যারা এই পত্রিকার নাম শুনেনি; বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর বাবাও ছিলেন এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। বঙ্গবন্ধু যখন রাজাকারদের পত্রিকা বন্ধের জন্য তথ্যমন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন তখন এই পত্রিকাও বন্ধ করে দেয়া হয়। এর পিছনে ছিল ইসলামিবিদ্বেষী শক্তির অপতৎপরতা। মাওলানা এ সবই জানতেন, তাই পত্রিকা বন্ধের পরও প্রায় দুইমাস কোন অভিযোগ জানান নি। অথচ রাষ্ট্রপতির সাথে তখনও তাঁর তুই-তুকারি সম্পর্ক।

বস্তুত 'ছাত্র বঙ্গবন্ধুর' সাথে 'ছাত্র মহিউদ্দিনের' স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যে সম্পর্ক ছিল, 'রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর' সাথে স্বাধীনতা পরবর্তী 'মাওলানা মহিউদ্দিন' সেই সম্পর্ক থেকে অনেকটাই নিজেকে দূরে সড়িয়ে আনেন। এটাই হকপন্থী আলিমদের বৈশিষ্ট্য। পূর্বযুগে সালাফরাও ছিলেন এমনই। তাঁরাও রাজা-বাদশাহের দরবারে ধর্ণা দিতেন না, রাজা-বাদশাহের তোষামোদে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন না। কিন্তু যখন বঙ্গবন্ধুর বাবার চিঠি হাতে পৌঁছাল তখন তিনি নিজেকে দমাতে পারলেন না। বৃদ্ধ মানুষটির কষ্ট তাঁকেও আঘাত করেছিল। তাই তাঁকে ও তাঁর পত্রিকাকে রাজকারের তোকমা দিয়ে যে রাষ্ট্র নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল বাধ্য হয়ে সে রাষ্ট্রের কাছে ছুঁটে গিয়েছিলেন; পত্রিকা আবারও চালু করার অনুরোধ জানাতে নয়, বরং চিঠি পাঠানো বৃদ্ধ মানুষটির মনোবেদনা রাষ্ট্রকে অনুভব করাতে। কিন্তু চিঠি পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যায়। সম্পাদকের হাতে চিঠি পৌঁছানোর আগেই প্রেরক দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে প্রিয় পত্রিকা ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য তাঁর নির্মম ভাগ্যে জুটে নি। বঙ্গবন্ধু নিজেও এটা নিয়ে বেশ আক্ষেপ-আফসোস করতেন। রাগে তথ্যসচিবকে অনেক গালাগালিও করেছিলেন।

সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান জীবিত থাকতে বাংলার ইসলামিবিদ্বেষের তিক্ত অভিজ্ঞতা পরিলক্ষণ করলেও তখন তাঁর একার করার মত কিছুই ছিল না তেমন। তবুও পত্রিকার মাধ্যমে সাধ্যের সবটুকু দিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন আজীবন। ইতিহাসে এর নজির অগণিত যে, রাষ্ট্রের বাইরের শত্রুরা ভেতরের গাদ্দার ও মুনাফিকশ্রেণী তৈরি করে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র এঁটে এসেছে; এটা সেকালে যেমন সত্য একালেও তেমনই সত্য। তবে মাওলানার জীবন এক্ষেত্রে অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি হাল ছেড়ে দেন নি, হাজারো অন্ধকারের ভিতর একটুকরো আলো নিয়ে মানুষের দ্বারে-দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। সেই আলো থেকে জন্ম হয়েছে আরও অসংখ্য প্রদীপের। বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামের শানশওকত জানান দিতে হলে মাওলানার জীবন এক্ষেত্রে এক অনুকরণীয় আদর্শ। ■ (সংক্ষেপিত)

কলমের আকুতি

শুয়াইব আল হামিদ

কলম। মনের ভাব ও হৃদয়ের ভাবনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে নীরব সহযোগী। নিরঙ্কুশ সাধনা আর নিরলস তপস্যায় উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা যার সর্বাগ্রেই বলা চলে। ভোর-সাঁঝের ঘোর কাটিয়ে মানুষ যখন উপনীত হয় কোলাহলমুক্ত গভীর নিশীথে, কলমের সাথে মাতামাতি করে তখন সে একা নিভৃতে। ডায়েরির পাতায় আঁকাআঁকি করে দিনলিপির চিত্র। অনিন্দ্য সুন্দর ও নিপট সত্যের প্রহরায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সঙ্গী হিসেবে একটা কলম-ই কাফি। আপাত দৃষ্টিতে কলম গাত্র-দেহ কাঠামো আর মূল্যের বিচারে নিতান্তই সাধারণ। অথচ তার অর্থ ও মর্ম– কত ব্যাপক! কত গভীর! তার মাধ্যমে সুসম্পন্ন কাজগুলো কতইনা অসাধারণ! কত বিশাল-বিস্তৃত! মামুলি একটা কলমও ক্ষেত্রবিশেষ ঘটাতে পারে কঠিন বিপ্লব। গড়ে তুলতে পারে দুর্বার আন্দোলন। দিতে পারে চ্যালেঞ্জিং জবাব। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির উপাখ্যান লিখে যায় মানুষ প্রতিনিয়ত নির্বিঘ্নে- নিশ্চিন্তে- কলমের সাহায্যে। জীবনের কোন এক অনুষঙ্গকে উপজীব্য করে তৈরি করে বিশাল দাস্তান। সময়ে বন্ধুও পিছু টান দেয় নিদারুণভাবে; বন্ধুত্বের রশি যখন নিক্ষিপ্ত হয় স্বার্থের আস্তাকুঁড়ে। কলম কিন্তু এমন নয়। মানুষের সঙ্গ দেয় সে হরহালতে। যাকে বলা যায়– অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ, নিঃস্বার্থ সমর্থন। তাই কলম আমার বন্ধু। পরম বন্ধু। কলমের সাথে হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক গভীর এবং নিবিড়।

পরস্পরে আমাদের বলাবলি, চাওয়া-চাওয়ি একটি ফিতরতি বিষয়। জীবনপথে আবেদন-নিবেদন একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের মতন কলমেরও যে আছে কিছু কথা! কিছু আকুতি! প্রাণ খুলে বলতে তারও স্বাদ জাগে। কিন্তু পারেনা; বাকশক্তি নেই বলে। আমরা যখন কলম দিয়ে ভালো কিছু লিখি; কুরআনের কথা; হাদিসের বাণী; ইনসাফের চাদরে আবৃত করে নির্জলা সত্যটিকে ফুটিয়ে তুলি দারুণভাবে, কলম তখন প্রবোধ লাভ করে। প্রশান্তি অনুভব করে। আনন্দবোধ করে। হকের পথে তাকে ব্যবহারকারীর জন্য দুআ করে রাব্বুল কলমের দরবারে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন কলম ধরে অন্যায়-অবিচার, খেয়ানত, অনাধিকারচর্চা আর অসত্যের পথে, কলমের তখন ভীষণ কান্না পায়। এতে তার বড্ড কষ্ট হয়। নীরবে নিঃশব্দে সইয়ে যায় সে অবক্ত ক্লেশ-যাতনা। দুশমনেরা যখন কলমকে ব্যবহার করে রাব্বুল কলমের বিরুদ্ধে, দ্বীন-ইসলামের উপর অসত্যের কালেমা লেপন

করতে ওঠে পড়ে লাগে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ঘুরতে হয় তাদের কদর্য পাপিষ্ট হাতের চাকায়।

কলম নিয়ে যখন লিখতে বসি- কর্ণকুহরে একের পর এক ধ্বনিত হয় তার আকুতিগুলো। ভাবনার অলিন্দে ভাস্বর হয়ে ওঠে তার যন্ত্রণার চিত্রগুলো। কলম যেন বলে– দেখো, সযত্নে আগলে রেখো আমারে! আমি তোমাদের মতন সত্যাশ্রয়ীদের ক্যাম্পে আশ্রিত থাকতে চাই। আমাকে যত্রতত্র অবজ্ঞা-অবহেলায় ফেলে রাখলে তোমাদের সম্মুখীন হতে হবে অবশ্যাম্ভীভাবে ভয়াল পরিণতির। তোমরা যদি ব্যর্থতার পরিচয় দাও, তাহলে শত্রুরা আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে তোমাদের দিকেই ছুড়ে মারবে বিষাক্ত বাণরূপে। পাছে তোমরা হারাতে পারো সোনালী ইতিহাস-ঐতিহ্য; এমনকি অস্তিত্বও। অধিকন্ত এহেন আচরণে আমারও কষ্ট হয় প্রচণ্ড। সুতরাং নিজেদের ও আমার কথা ভাবনায় জিইয়ে রেখে অদ্য থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, শত্রুদের হাতে নির্দয়ভাবে আমাকে ছেড়ে দেবে না! ভুলে যাবে না তো? কথা রাখবে তো? অপেক্ষায় রইলাম!

✍ **শুয়াইব আল হামিদ**
শিক্ষার্থী : ইসলামী রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা।

কবিতা

বর্ষা

✍ মুহাম্মদ লিসান

বৃষ্টি নামে ঘাস বনে আর ছোট নদীর বাঁকে,
সবুজ বনের মনটা তখন আকাশ পানে থাকে।
রাস্তা-ঘাটে সকল মানুষ হাঁটে ছাতা হাতে,
গরু গুলো ঘরে ফিরে থাকেনা আর মাঠে।
পাখপাখালি ডানা মেলে উড়ে ফিরে নীড়ে,
মনটা আমার উল্টো চলে থাকে না আর ঘরে।

✍ **কবি :** শিক্ষার্থী,
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

শীতের আগমনী বার্তা

✍ মাসউদ মাহমুদ

দু-দিন যাবত ভীষণভাবে জ্বলে উঠছে রোদের মুখ। প্রভাত গড়াতেই রোদের তেজ আছড়ে পরে জমিন পিঠে। কিছু বেলা পূর্বের মিঠেল রোদ হয়ে উঠে অগ্নিশিখার মতো। তেজি সূর্যটা দ্বিগুণতর ফুঁসে ওঠে। ধীরে ধীরে তপ্ততার ঘনত্ব হয়। পথ চলতে চলতে বিরক্তিভাব জেগে যায়। বোধহয় এ যেন জলন্ত ফুলকি ঝরে ঝরে পড়ছে ঝাঁকড়া মাথায়। উত্তপ্ত মরুভূমি মনে হয় চারপাশের সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিটাকে।

দুপুর গড়ানোর সাথে সাথে রোদের প্রবাহ থেমে যায়। জলন্ত কয়লা গরম সূর্যটা নিভতে থাকে। রোদের বুকচিরে বয়ে যায় শান্ত সমীরণ। হৃদয়ে নেমে আসে স্বর্গীয় সুখ। মনটা আনচান করে ওঠে। এই তপ্ত রোদ থেকে একটুকরো আয়েশ মিলে। অস্থিরতাকে তাড়াতে আকাশ কালো হয়ে আসে। আলোকিত চারপাশ মুহূর্তে ঝাঁপসা হয়ে ওঠে। কালো কালো মেঘগুলোর আড্ডা জমে ওঠে ভীষণভাবে।

সূর্য হেলে পড়েছে অনেক্ষণ হল। নিঝুম ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। পাতা-পল্লব চুয়ে চুয়ে পড়ছে বৃষ্টিফোঁটা। গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে ওয়াল ঘেঁষে। শীতল সমীরণ নাড়া দিচ্ছে অন্তরাত্মা। সমস্ত চরাচর শীতল হয়ে গেছে। অথচ মুহূর্তকাল আগে আকাশ ফুঁড়ে নামা রোদ্রের প্রতাপ তামা করে তুলছিল। পিচডালা পথ হয়ে উঠছিল আগুনের কড়াই। ভ্যাপসা গরমে অস্থির হয়েছিল প্রতিটি প্রাণ। হাহাকার নেমে এসেছিল জগৎ জুড়ে। এটা মহান রবের রহমত বৈ কিছু না।

✍ **লেখক : মাসউদ মাহমুদ**, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

নারীর সজ্জা কিসে?

✍ নিজামুদ্দিন সায়েম

আজীব একটা বিষয় খেয়াল করলাম, 'যে বুঝে সে খোজে' কথাটার অর্থ; সেদিন আমি কড়ায় গণ্ডায় বুঝলাম। আসলে যে নারী নিজেকে চেনে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্য বোঝে, সে নারী পুরুষ দেখলেই নিজেকে সংরক্ষিত রাখার জন্যে পর্দা হলেও খুঁজে।

বিকেল গড়িয়ে যখন মাগরিবের মিটিমিটি আঁধার ছড়াল, তখন বাসা থেকে বেরিয়ে সায়েম আর আমি বাতাবাড়িয়া স্কুলমাঠের দিকে যাচ্ছিলাম। ঠিক সে সময় হুট করে বিদ্যুৎ চলে গেলো। আকাশের গর্জনে এদিকে হঠাৎ দাউদাউ করে খাম্বায় আগুন জ্বলে ওঠলো। প্রথমত বিষয়টা স্বাভাবিক মনে হলেও পরক্ষণে শরীরটা কাঁপুনি দিয়ে উঠলো। অবাক চিত্তে দুজন মিলে তাকিয়ে রইলাম। ভিডিও করতে লাগলো অনেকেই। আবার কিছু লোক তো ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলো। অবশ্য সায়েম ছোট থেকেই খুব সাহসী। তবে এ অকল্পনীয় চিত্র দেখে সেও তখন ভয় পেয়ে গেলো। খুব ভয়ানক অবস্থা। দোয়া দুরূদ তো সবার মুখে মুখে। ওদিকে হাউমাউ করে মহিলাদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল আমার। তৎক্ষণাৎ ফোন করলাম ৯৯৯-য়ে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটা বললাম। তিনি বিষয়টা হয়তো বোঝেননি অথবা কেয়ার করেননি। যাই হোক, এদিকে শোরগোল লেগে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গেলো। সবার মধ্যে একঝাঁক আতঙ্কের ছাপ। কেউ পানি দিচ্ছে, কেউ বা আবার বালি ছিটছে। এটা-ওটা দিয়ে আগুন নেভানোর খুব চেষ্টা চালাচ্ছিলো। প্রায় অর্ধঘণ্টা পেরিয়ে গেল। সময় যতো বাড়ছে আগুন তত সামনে এগোচ্ছে। কান্নার ছাপ ভেসে উঠছিল সবার চোখে-মুখে। আগুন বাড়তে বাড়তে এদিকে তানিয়ার বাড়িতেও লাগল। একটু একটু করে পুড়ে যাচ্ছিল গোটা বাড়ি, পুরো সংসার। তারের গন্ধ আর কালো ধোঁয়ায় চোখে আমি ঝাপসা দেখছিলাম চারদিক। পাগলের মতো এদিক ওদিক ছুটছিলাম। ঠিক সে সময় ফায়ারসার্ভিসের শব্দ শুনতে পেলাম। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সবাই মিলে চিল্লায়া পড়লাম আলহামদুলিল্লাহ।

ফায়ারসার্ভিসের লোকজন গাড়ি থেকে নেমেই মোটা পাইপ লাগিয়ে হাইস্পিডে পানি দিয়ে ফাস্টে আগুন নেভাল। তারপর হ্যান্ড মাইক দিয়ে ঘোষণা করে বলল, সবাই ঘর থেকে বের হতে। লোকেদের হট্টগোল লেগে ছিলো পুরো বাড়িজুড়ে। এলাকার সব মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছিলো ঘটনাস্থলে। বাড়ির পুরুষেরা বের হলো ঠিকই; কিন্তু মহিলারা কেউ কেউ এত পুরুষ দেখে বের হতে পারছিলো না। ঠিক তখন খেয়াল করে দেখলাম, কেউ একজন দরজার পর্দা প্যাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না লোকেদের ভিড়ে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মহিলারা নিজেদেরকে বিলিন না করে গোপন করে রাখাটা এলাকার সব লোকের মনেই একটা জলজ্যান্ত প্রশ্ন তৈরি করলো! তবে পরক্ষণে ধর্মীয় দিক লক্ষ্য করে সবার এস্সারই একযোগে মিলে গেলো। বাড়ির নারীদের প্রতি উল্টো ভক্তি শ্রদ্ধা আরও তীব্র হয়ে উঠলো সবার মনের মধ্যেই! এখান থেকে এটাই বুঝলাম– সর্বাবস্থায় নারীর লজ্জা, এটাই নারীর অহংকার এবং অলংকার । সর্ব অবস্থায় দায়িত্বটা আসলে নিজের কাঁধেই নিতে হয়। ■

✍ **লেখক :**
শিক্ষার্থী, মাদ্রাসাতুল মাদিনা কামরাঙ্গীচর, ঢাকা।

শুক্রবারের দিনলিপি

✍ মাহমুদ মিসবাহ

শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন, এ কথাটি ধীরে ধীরে আমার ক্ষেত্রে অসত্যে পরিণত হচ্ছে। পড়ালেখা যতোটা এগুচ্ছে, জীবন থেকে ছুটির সময়টুকু ততোটাই বিদায় নিচ্ছে। হিফজ বিভাগে পড়ার সময় এটা ভেবে সান্তনা পেতাম যে, কিতাব বিভাগে গিয়ে অনেক ছুটি পাব। অবসর সময়ে ঘোরাফেরা করতে পারব। এখন দেখি আমার ভাবনার পুরো বিপরীত। শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একাধারে দরস, তাকরার, মুতালা'আ করার পর সপ্তাহের মাঝে সময় বের করা একপ্রকার অসম্ভব । ভাবি যে শুক্রবারে। শুক্রবারকে ঘিরে কত কিছুর প্ল্যান থাকে, অথচ কোন সময় একটাও পূর্ণ করতে পারিনা।

আজ সব বাধাকে উপেক্ষা করে ইচ্ছায় অটল থেকে, জুম্মার আযানের পূর্বে সাপ্তাহিক পড়া শেষ করে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাই। পুরো সপ্তাহ চার দেয়ালের ভিতর থাকায় রোদের প্রখরতা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। মাদ্রাসার গেইট পার হতেই বুঝতে পারি কাঠফাঁটা রোদের তীব্রতা। তেজোদীপ্ত সূর্যটা ঠিক মধ্যাহ্নে অবস্থান করছে। আলোর সাথে মনে হল অগ্নির ফুলকি ঝরছে!! কিছুদূর হাঁটতেই পাঞ্জাবিটা ভিজতে শুরু করে। মালিবাগ রেলগেইট মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি তরঙ্গ প্লাস নামক বাসের অপেক্ষায়। কিন্তু এতোটুকুন একটা বাসেরও আজ দেখা নেই। অসহ্য গরমের টিকে থাকাটা মুশকিল হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে রমজান বাসে আরোহণ করি। মোবাইলবিহীন যাত্রীর জানালা দিয়ে ব্যস্ত শহরের উঁচু ভবন আর অফিস-আদালত দেখা ছাড়া কোনো গতি নেই। চিরচেনা ভবন আর পথচারীদের দেখতে দেখতে, বাসটি কাকরাইল মসজিদ হয়ে শাহবাগ চত্বরে এসে থামে। সিগন্যালের দরুণ থেমে আছে আমাদের বাস। তাকিয়ে আছি শাহবাগ মোড়ে ফুলের দোকানগুলোর দিকে। কী সুন্দর! লাল-নীল, সাদা-কালো, কত রকমের ফুল। বিমুগ্ধ দৃষ্টিটা কেড়ে নিল জীর্ণ গঠনের একটি ছোট্ট মেয়ে। ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত। হিজাবে আবৃত মাথা। লেমেনেটিং করা একটি কাগজের প্ল্যাকার্ড হাতে নিচু আওয়াজে কি যেন বলছে। ঠিক শুনতে পারছি না। তবে বুঝতে পেরেছি সহযোগিতার জন্য এসেছে। সিটের পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, 'ভাইয়া! একটা চকলেট নিবেন! প্লীজ আমাকে সাহায্য করুন!' ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লেগেছে এটা ভেবে যে, এই শিশু মেয়েটি ভিক্ষা করছে না বরং চকলেট বিক্রি করে জীবিকার চাহিদা পূরণ করছে। একই সাথে আমায় বিস্মিত করেছে তার সঠিক উচ্চারণে বিশুদ্ধ ভাষা। তার চেহারায় ছিল ভদ্রতা ও আভিজাত্যের স্পষ্ট ছাপ। বুঝতে পারছিলাম পেশাদার ও ধোকাবাজ কোন পথ শিশু না। বরং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর পারিবারিক বিপর্যয় তাকে এ পথে চলতে বাধ্য করেছে। আমি আমাদের দু'জনকে দুটো চকোলেট দিতে বলি। সে দুইটা কফিবাইট চকোলেট আমাদের দিয়েছে। বিনিময়ে আমি হয়তো তার চাহিদা অনুযায়ী দিতে পারিনি, তবে আমার সাধ্যের সর্বোচ্চটা দেয়ার চেষ্টা করেছি। ফলে দেখা গেছে আমার একটা প্রয়োজন অপূর্ণ রেখেই সেদিন মাদরাসায় ফিরতে হয়েছে। এতে কি আর আসে যায়!? প্রয়োজন হয়তো আল্লাহতায়ালা পূর্ণ করে দেবেন। কিন্তু তখন তার মুখে হাসির যে ঝিলিক আমি দেখতে পেয়েছি, সেটা হয়তো অন্য সময় লক্ষ টাকা দিয়েও ফোটানো সম্ভব হতো না।

✍ **লেখক :** শিক্ষার্থী, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

সময়ের বিরূপ আচরণ

✍ আজিজুল মতিন

সময়! এক আশ্চর্য শক্তি। যার বেষ্টনে পুরো পৃথিবী আবদ্ধ। যার জালে গোটা পৃথিবী বেষ্টিত। সময় তার ভাব-স্বভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ন্যায়-নীতিতে একেবারে অনন্য। সৃষ্টিলগ্ন থেকে এক ধাঁচে বহমান। সময়ের বিবর্তনে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে সফল হয়েছে মানুষ। সংগ্রহ করতে পেরেছে নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নানান তথ্য-উপাত্ত। অনেক অকল্পিত বিষয়ের বাস্তব চিত্রদানে সফলতা অর্জন করেছে তারা। কিন্তু আদৌ সময় ও তার ভাবধর্মের ভেদ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি কেউ। উপলব্ধি করতে পারেনি তার ভাব মনোভাব।

ভূমণ্ডলের প্রাণ ও প্রণীত সবকিছুই সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ। তার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। তাকে উপলক্ষ করে উত্থান হয়েছে বহু জাতী-মহাজাতির! আর তাকে ঘিরেই পতনের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কত দল-উপদল। কালের কত মহাপুরুষ ঠাঁই পাইনি তার কদমের নীচে। প্রাচুর্য ও রুপ সৌন্দয্যে মণ্ডিত কত মানব তলিয়ে গেছে তার প্রবাহমান স্রোতে। সময়ের বুকে চিরদিন বাস করার সুযোগ হয়নি কারো। সে যাকে আপনবুকে সাদরে গ্রহণ করে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে ঠেলে দেয় ধ্বংসের দিকে। সময়ের বিরুপ ব্যবহারে কেউ অতিষ্ঠ কেউ তার সদয় আচরণে সন্তুষ্ট। এটাই তার চিরচারিত অভ্যাস। সময়ের গতি রোধ করতে পারে না কেউ। তবে তার গতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব। সুতরাং প্রতিটি মানবকুলের হৃদয়ের তামান্না ও জীবনের পণ হওয়া উচিত নিজের ভবিষ্যৎ জীবন যেন তলিয়ে না যায় সময়ের স্রোতে, বরং নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেন সে তার কাঁধে ভর করে।

✍ **লেখক :** শিক্ষার্থী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,বসুন্ধরা, ঢাকা।

এক টুকরো সুখের সন্ধানে

✍ মোল্লা আমীর আল মুহারিব

সুখ, সে তো খুব অভিমানী। অনেক দামী। কুড়াতে চাইলেই কুড়ানো যায় না। ছুঁতে গেলেই ছোঁয়া যায়না। জমিয়ে রাখা যায়না। ধরে রাখা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন কঠোর অধ্যবসায়। একনিষ্ঠ আরাধনা। দৃঢ়চিত্তের উপাসনা। চাইলেই কি আর সুখের সন্ধান পাওয়া যায়! পৃথিবীতে সুখসন্ধানী কত মানব আজ অবধি এই সুখ নামক সোনার হরিণিটির পিছু পিছু হন্যে হয়ে দৌড়ঝাঁপ করেছে! তাঁদের ক'জনইবা সফল হয়েছে এই দৌঁড়ঝাপের তিক্ত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়! হয়তোবা হয়েছে। সবাই কি আর হতে পেরেছে? সবাই কিভাবে হবে। পৃথিবীর সব মানুষ কি আর সবকিছুর সন্ধান পেয়েছে? কেউ পেয়েছে তো কেউ হারিয়েছে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। এসব কথার উর্ধ্বে গিয়ে যে কথাটি বলতে হয় তা হলো, মানুষ সুখী হতে চায়। শান্তিতে বাঁচতে চায়। সমৃদ্ধি নিয়ে চলতে চায়। আরো অনেক কিছুই চায়। এটা মানুষের ফিতরাত। তবে, মানুষ একটি জায়গাতে চরমভাবে ভুল করে। সেটি হলো, মানুষ তার চাওয়াগুলো চাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে দেয়। পাওয়ার জন্য যে সীমাহীন কসরতের প্রয়োজন। সেটা থেকে অধিকাংশ মানুষই মুখ ফিরিয়ে রাখে। অথচ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তিও রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি। (সূরা আশ শারহ : ৫-৬)

হযরত আনাস ﵁ বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। তাঁর সামনে ছিল একটি গর্ত, তিনি সেই গর্তের দিকে ইশারা করে বলতে লাগলেন,

لَوْ جَاءَ الْعُسْرِ فَدَخَلَ هَذَا الْجحر لَجَاءَ الْيُسْرِ حَتَّى يَدْخُل عَلَيْهِ فَيُخْرِجهُ.

অর্থাৎ, যদি কষ্ট-দুর্ভোগ এই গর্তে এসে প্রবেশ করে থাকে। তাহলে সুখ-সাচ্ছন্দ্যও আসবে, এমনকি এই গর্তে এসে প্রবেশ করবে। অতঃপর গর্তের ভিতরে থাকা দুঃখকষ্টগুলো বের করে দিবে।

সুতরাং, এটি অনস্বীকার্য অমোঘ বাস্তব কথা যে, জীবনে আপতিত দুঃসময় ও দুর্দিনের পিছু ধরেই আগমন করে সুসময় এবং সুদিন। আমাদের কাছে এতটুকু ব্যাপার স্পষ্ট হওয়া জরুরী যে, জীবনে ত্যাগ করেই ভোগের আসনে আরোহণ করতে হয়। বিসর্জন দিয়েই অর্জনের মিষ্টতা আস্বাদন করতে হয়। ত্যাগ ছাড়া ভোগ আর বিসর্জন ছাড়া অর্জনের আশা করাটা বোকামি বৈ ভিন্ন কিছু হতে পারেনা। জীবনে দুঃখ,কষ্ট, সংকট দেখা দিবে। আষ্টেপৃষ্টে ধরবে অসহনীয়, অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। পিষ্ট করে দিবে অসহ্য কতগুলো মর্মপীড়া। চারপাশ ঘিরে নেমে আসবে বেদনার নিগুঢ় অমানিশা। বিদঘুটে অন্ধকার। অজস্র অব্যক্ত চাপা কষ্টের ভারে দেহটা নিশ্চল হয়ে যাবে। যেনো পুরোটা পৃথিবী প্রতিকূলতায় ছেয়ে গেছে। এমন অপ্রতুল মুহূর্তে চোখ দুটো দিগন্তে অপলক তাকিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনে যায়। সুবিমল, সুনির্মল সময়ের অপেক্ষা। কখন কাটবে জীবনের দুর্বিষহ এই মুহূর্তগুলো। আর কতোকাল অতিবাহিত হলে অবসান ঘটবে নিদারুণ বিষাদে ভরা এই দিনগুলোর! কতো কাল! অতঃপর কিছুকাল এভাবেই কেটে যায়। আচমকা আরশের মালিক তাঁর রহমের ফোয়ারা থেকে এক ফোঁটা রহম সুখ সন্ধানী মানুষটির শুষ্ক হৃদয়ে বর্ষণ করেন, এক টুকরো সুখের মহক দিয়ে। শীতল সজীব প্রলেপ দিয়ে। কৃতজ্ঞচিত্তে মানুষ টি তখন বলতে থাকে 'লাকাল হামদু ইয়া রাব্বি ওয়া লাকাশ শুকরু ইয়া রাব্বি!'

✍ **মোল্লা আমির আল মুহারিব,** শহিদ বাড়িয়া।

সিদ্ধান্ত

✍ ইউসুফ খন্দকার

আজ আকাশে মেঘ নেই। কোনো পাখির দেখাও নেই। নেই সূর্যের উচ্ছ্বাসমাখা কিরণ। আকাশটা ঢেকে আছে ধূসর ধূলোয়। হিমেলের মনও আজ ভালো নেই। বিষণ্নতায় ঢেকে আছে তার হৃদয়-আকাশ। চোখে-মুখে চিন্তার আভাস। আর দুদিন পরই তার এসএসসি পরিক্ষার রেজাল্ট দিবে। কী হবে রেজাল্ট আল্লাহই ভালো জানে। অবশ্য হিমেল পরিক্ষাটা ভালোই দিয়েছে। তারপরেও চিন্তা লাগছে ভীষণ। আব্বু কড়া কণ্ঠে বলে দিয়েছেন যদি গোল্ডেন A+ না পায় তাহলে এবার তার জন্য আর বাড়িতে জায়গা নেই। মা বলেছে ছেলে হিসেবে পরিচয় দিবে না। বড় ভাই বলেছে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট না পেলে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া পূরণ করবে না। বড় বোনসহ অনেকেই বলেছে কঠিনকথা। এর আগে জিএসসি পরিক্ষায় পেয়েছিল A+ কিন্তু সকলের আশা ছিল যেন গোল্ডেন পায়। এই কারণেই এখন এতো কঠিন কঠিন কথা বলেছে সবাই। হিমেলের মাথায় এসব কথা আসলেই চিন্তায় বিভোর হয়ে যায়। যদি গোল্ডেন না পায় তাহলে কি সত্যিই তাকে এমনসব মুহূর্তের সম্মুখীন হতে হবে? এসব ভাবতেই বিষণ্নতায় ছেয়ে যায় হিমেলের মন।

আজই হিমেলের পরিক্ষার রেজাল্ট দিবে। শিক্ষকরা সকাল নয়টার মধ্যে সকলকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। হিমেল তড়িঘড়ি করে সাড়ে আটটা বাজার আগেই স্কুলে উপস্থিত। গিয়ে দেখে এখনো কেউ আসেনি। হিমেল বারান্দায় বসে রইলো। সময় যত যায় ততই হিমেলের অস্থিরতা বাড়ে। চোখ বন্ধ করলেই শুনতে পায় মা-বাবার কঠিন কঠিন কথাগুলো। কিছুক্ষণ পরই হিমেলের ক্লাসমেটরা সকলে উপস্থিত হয়।

একে একে নাম ঘোষণা করে রেজাল্ট বলা হচ্ছে। কেউ A+ , কেউ A-, আবার কেউ টেনেটুনে পাস করেছে। তবে সকলেই খুশি। ক্ষণিক পরেই নাম ঘোষনা হলো হিমেলের। সাথে বলা হলো সে A+ পেয়েছে। শুনামাত্রই হিমেল বোবা-কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তার রেজাল্টে সকল শিক্ষকরা খুশি হলেও সে এখন বেরাজ । তার কানে ভেসে আসছে মা-বাবার সেই কঠিন কথা। কী করবে এখন, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। বাড়িতে গেলেও বিপত্তি ঘটবে। মাথাটা চিন্তায় ভোঁন ভোঁন করছে। কেন আমার সাথেই শুধু এমন হয়? ভালো পরিক্ষা দেওয়ার পরেও গোল্ডেন A+ পাই না কেন? কেন ই-বা আমার পরিবার শুধু A+ এ খুশি নয়? চিন্তার এমন মুহূর্তে হিমেল নিয়ে বসে মারাত্মক সিন্ধান্ত। সে তার এই অপ্রাপ্ত জীবন রাখতে যায় না। যে জীবনে পরিবারের কাউকেই খুশি করতে পারেনি সেই জীবন রেখেই বা কী লাভ? হিমেল ছুটে গেলো স্কুলের পাশ ঘেষা রেল লাইনে। টেন আসতে তখন বাকি মাত্র এক মিনিট। টেনটি কাছে আসার পর বারবার হর্ন দিচ্ছিলো হিমেলকে সরে যাওয়ার জন্য কিন্তু হিমেল তার জায়গায় অনড়। নিমিষেই টেনের নিচে পিষে যায় হিমেলের দেহ। হারিয়ে যায় একটি প্রাণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীড় জমে যায় হিমেলের দ্বিখন্ডিত দেহকে ঘিরে। খবর দেওয়া হয় হিমেলের পরিবারকে। ছুটে আসে তারা মৃত হিমেলের লাশের পাশে। কিন্তু এখন অশ্রু ঝড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

'আপনার সন্তানকে পড়ালেখার প্রতি চাপ দিন। তবে তার মাত্রা যেন এতো না হয় যে তাকে হিমেলের মতো সিন্ধান্ত নিতে বাধ্য করে।'

লেখক :
শিক্ষার্থী, জামিয়াতু ইবরাহীম, সাইনবোর্ড, ডেমরা, ঢাকা।

কবিতা

খুকুর বায়না

ইয়াসীন আবরারী

বিকেল শেষে সন্ধ্যে নামে বিষাদ ছড়িয়ে,
খোকা-খুকু নীড়ে ফিরে আঁধার জড়িয়ে।
সন্ধ্যানুরাগ যায় কেটে যায় নিগুঢ় অন্ধকারে,
ঝিম ধরে যায় চঞ্চলা মন নিবিড় বদ্ধঘরে।
লেপ্টে থাকে পায়ের তলায় কাঁদা মাটির ঢের,
চুপটি করে যায় ঘুমিয়ে মা পায় না টের।
পড়ার কথা বললে পেটে চিনচিনিয়ে উঠে,
আম্মু বকেন তখন তাদের বেতটি নিয়ে মুঠে।
আদরমাখা শাসনেতে অভিমান করে খুকু,
তখন আবার বায়না ধরে রক্তিম মুখটুকু।
অভিমান ভাঙ্গার কৌশল আছে মার,
রাগ করোনা ছোট্ট সোনা বকবো না তো আর।

কবি :
শিক্ষক, হুসাইনিয়া মাদ্রাসা পশ্চিম এওয়াজপুর ভোলা।

তামান্না

ইলিয়াস হায়দার

তোমার চলার পথে যদি আমি
ফুল হয়ে নবী ফুটতাম গো
তোমার সহিত খেলিবার লাগি-
চাঁদ হয়ে যদি ছুটতাম গো,
তোমার শরীর বেয়ে পড়া ঘাম
মেশকের মতো মাখতাম গো
তোমার সহিত তায়েফে-সাওরে
সাথী হয়ে যদি থাকতাম গো,
তোমার সামনে যুদ্ধের মাঠে
ঢাল হয়ে যদি রইতাম গো
তোমার ইশকে শহিদি-খাতায়
নাম যদি মোর লেখতাম গো,
ওগো প্রিয় নবী আপনাকে আমি-
একবারও যদি দেখতাম গো!

কবি : নবীন লেখক ও প্রবন্ধিক।

লেখা আহ্বান

আলহামদুলিল্লাহ, পাঠকদের মন জয় করে এগিয়ে যাচ্ছে 'নাসিহাহ'। বিগত দিনে তিনটি সংখ্যা বের হয়েছে। প্রতিটি সংখ্যাই সেজেছে দেশবরেণ্য লেখকদের লেখনীতে এবং সমাদৃত হয়েছে পাঠকসমাজে। অচিরেই বের হচ্ছে ম্যাগাজিনের ৪র্থ সংখ্যা। আগামী সংখ্যার জন্য আপনার একান্ত নিজস্ব নির্বাচিত ও অপ্রকাশিত লেখাটি পাঠিয়ে দিন আমাদের ই-মেইলে। আর নিজেকে আবিষ্কার করুন ম্যাগাজিনের পাতায়! প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অণুগল্প, ভ্রমণকাহিনি, গল্প, কবিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বড়দের জীবনী, রোজনামচা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাণ খুলে লিখুন। নিজের লেখকসত্তাকে জাগিয়ে তুলুন এখনই। আর হ্যাঁ, অবশ্যই লেখাটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পাঠানো নিশ্চিত করুন।

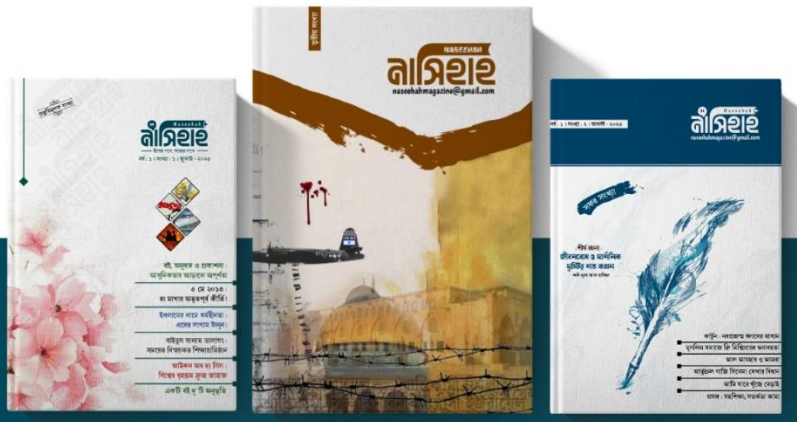

লেখা পাঠানোর ই-মেইল

naseehahmagazine@gmail.com

(ই-মেইল ব্যাতিত অন্য কোথাও লেখা পাঠালে গ্রহণযোগ্য হবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই একান্ত নিজস্ব ও অপ্রকাশিত লেখা পাঠাতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ সময়ের আপডেটসহ পত্রিকা-বিষয়ক যে কোন তথ্যের জন্য পত্রিকার পেইজ ফলো করুন)

facebook.com/naseehahmagazine

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।
- দীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ ছড়িয়ে দেওয়া।
- সমকালীন বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে সচেতন করা।
- লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো পাঠক পর্যন্ত পৌছে দেওয়া।
- লেখক ও পাঠকের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করা।
- এক প্লাটফর্মে সকলকে ঐক্য করা।
- সচেতনতামূলক বিভিন্ন লেখা প্রচার করা।
- ইসলামী বইয়ের সাথে ব্যাপক পরিচিতি গড়ে তোলা।

আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- পত্রিকাটির প্রিন্ট সংখ্যা প্রকাশ করা।
- ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ-সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সামাজিক সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ।
- একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- একটি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।
- একটি ইসলামী ওয়েবসাইট চালু করা।
- বিষয়ভিত্তিক পিডিএফ প্রকাশ করা।

যেভাবে আমাদের সঙ্গী হবেন

- সবসময় আমাদেরকে দোয়ায় শামিল রাখবেন।
- নিয়মিত নিজে পত্রিকা পড়বেন এবং অন্যকে উৎসাহিত করবেন।
- আমাদের প্রকাশনাগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করবেন।
- পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিবেন এবং ডোনেশন করবেন।

NASEEHAH
নাসিহাহ
naseehahmagazine@gmail.com